লং পাহাড়ের ডায়েরী

জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের
বেদতত্ত্ব আলোচনা ও ভাষণ সংকলন।।

অভিনব দর্শন

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

সমগ্র পরিকল্পনা, সংকলক, সংগ্রাহক ও প্রকাশক ঃ-
শ্রী চপল মিত্র

সংকলনে সহযোগিতায় ঃ-
ডঃ সুজাতা গঙ্গোপাধ্যায় ও হেনা মিত্র

প্রথম প্রকাশ ঃ-
৩০শে আশ্বিন, ১৪১৬ ১৭ই অক্টোবর, ২০০৯

মুদ্রণ -- মেসার্স এম. দত্ত
১১, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট কোলকাতা - ৭০০০০১

চিঠিপত্র ও বই সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় যোগাযোগ ঃ-
''অভিনব দর্শন''
স্বপ্ননীড় অ্যাপার্টমেন্ট, ৪নং পল্লীশ্রী, ২৯১ এস. কে. দেব রোড
পোঃ- শ্রীভূমি, পি.এস.- লেকটাউন, কোলকাতা-৪৮, ফোন - ২৫২১-৫১৯৬
মোবাইল - ৯২৩১৮-৯২০৮৫, ৯৪৩২৩-৭২০৭২
Email : bbt_sukchar@yahoo.co.in

Website : www.avinabadarshan.com

প্রাপ্তিস্থান ঃ-
১) ব্রহ্মচারী ধাম সুখচর, উত্তর ২৪ পরগণা, কোলকাতা - ৭০০১১৫
২) ১৯৭, লেক টাউন, ব্লক-বি, কোলকাতা-৮৯, ফোন - ২৫২১-৫১৪৬
৩) ২৯১ এস. কে. দেব রোড
পোঃ- শ্রীভূমি, পি.এস.- লেকটাউন, কোলকাতা-৪৮, ফোন - ২৫২১-৫১৯৬

সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত।

পূর্বাভাষ

ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ, আধ্যাত্মচেতনার পুণ্য ভূমি এই ভারতবর্ষ। এইধরার বুকে-বনে জঙ্গলে, নদনদী সাগরের সঙ্গমস্থলে, পাহাড় পর্বতের গুহা গহ্বরে সাধনা করে আসছেন যুগ যুগ ধরে বহু সাধু, মুনি, ঋষি, মহান। আমাদের বেদ-বেদান্ত, পূরান উপনিষদ এক একখানি মহাশাস্ত্র গ্রন্থ, মহাজীবন সঙ্গিত, যা মানুষকে সংসারের দুঃখ কষ্ট ভুলিয়ে এক পরমানন্দ, পরমশান্তির পথে নিয়ে যায়। এই আধ্যাত্মচেতনার মূল মন্ত্রই হলো আত্মার সাথে আত্মার সংযোগ, জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন। এরই জন্য বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে ছুটে আসেন এই পুণ্য ভূমিতে অগণিত মানুষ আধ্যাত্মচেতনার উন্মেষ ঘটিয়ে ইহজীবনে পরমশান্তির আশায়।

আমাদের শাস্ত্র গ্রন্থ শুধু পূজাপার্বন, যাগযজ্ঞ, জপতপ প্রভৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সমাজ সংসারকে নিয়েই আমাদের আধ্যাত্মচেতনা। আমাদের দেবদেবতারা শুধু ফুল, বেলপাতায় সীমাবদ্ধ ছিলেন না। সমাজ সংস্কারকল্পে তাঁরা অস্ত্র ধরতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি। যাঁরা জনজীবনে, জনকল্যানে আবিভূত হয়ে প্রকৃতধর্ম প্রতিষ্ঠাকল্পে ও সমাজের মঙ্গল কামনায় নিজেদের উৎসর্গ করেছেন, তাঁরা আজও সাধারণ মানুষের কাছে পূজনীয়, স্মরণীয়, বরণীয়। শ্রী রামচন্দ্র, শ্রী কৃষ্ণ - এদের মধ্যে আধ্যাত্ম শক্তির চরমবিকাশ প্রতিফলিত হয়েও এঁরা ফুল বেলাপাতা, যাগযজ্ঞ, পূজাপার্বণের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে প্রজাদের হিতার্থে, সংসারকে অসুর দানবের হাত থেকে রক্ষাকল্পে অস্ত্রধারনও করেছিলেন। প্রকৃত ধর্মকে রক্ষাকল্পে জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

ভারতীয় সমাজ জীবন প্রায়শঃই আধ্যাত্মচেতনা দ্বারা প্রভাবিত। তারফলে তথাকথিত বেশীরভাগ সাধু, গুরু, মহান জনগনের এই সেন্টিমেন্টের সুযোগ নিয়ে তাদের পরগাছার মত শোষন করে চলেছে। সমাজে অশান্তি তখনই শুরু হয় যখন সাধু গুরু মহানদের ভিতর পাপচক্র দানা বাঁধে। আজকের দিনে বেশীরভাগ সাধু, গুরু, মহানরা ধর্মের প্রকৃত অর্থ বিকৃত করে নিজ নিজ কল্পনা প্রসূত মতবাদ তৈরী করে, সেই মতবাদকে শ্রেষ্ঠ বলে জাহির করবার জন্য বেদ, পূরান, কোরান, বাইবেল এর প্রকৃত অর্থ বিকৃত করে বিভিন্ন উবাচ, ভাষ্য, টীক-টিপ্পনি তুলে ধরে নিরীহ জনগনকে এক চরম বিভ্রান্তির মাঝে ফেলে সমাজকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। রাক্ষস, অসুর, দানব আমরা কখনও দেখিনি। কিন্তু আজকের সমাজের যারা জোতদার, মজুতদার, মুনাফাখোর, ধর্মব্যবসায়ী এদের দেখলেই অসুর, দানবদের রূপগুলো কল্পনা করা যায়। আর ধর্মের প্রকৃত অর্থই হলো এই অসুর, দানব গোষ্ঠীকে একেবারে নির্মূল করে সমাজকে মুক্ত করা। আর আমরা যদি আমাদের শাস্ত্রকে প্রকৃতধর্ম বলে মনে করি, তবে যারা সাধু, গুরু, মহান তাদের এই কাজে আগে এগিয়ে আসা উচিত। অথচ এরা কখনও সমাজ জীবনের পাদপ্রদীপের সম্মুখে দাঁড়ান না। জনসমাজ ও জনচেতনার গভীরে প্রবেশ করেন না। শুধু হাল্কা বাহাদুরী দেখিয়ে জনপ্রিয়তার দিকে মনোনিবেশ করেন। এরা নিজেদের এক একজন ব্রহ্মজ্ঞ, বেদজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ, মহাত্মা, অবতার, উচ্চকোটি সাধক, সাধিকা বলে সমাজে পরিচয় দিয়ে নিজেদের ঢাক নিজেরাই পিটিয়ে চলেছে।

জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজ বাল্যকালে প্রায়শঃই পাহাড়ে চলে যেতেন। সেই সব পাহাড়ে অনেক পৌরানিক জায়গা আছে। বছরের বিভিন্ন সময়ে নানা অনুষ্ঠানে বহু সাধক, সাধিকা, সাধু, মুনি, ঋষি, মহানরা সেখানে সম্মিলিত হন এবং ধর্ম সম্বন্ধে যার যার অভিমত পোষণ করেন। বিশাল ভারতে বহু বিচিত্র সাধু সমাজ। তাদের নানা মত, নানা পথ। কাউর মতের সাথে, কাউর মতের মিল নেই। তারা তাদের নিজ নিজ মতকে শ্রেষ্ঠ প্রমান করার জন্য শাস্ত্রের যে পথ পদ্ধতি আছে, সেইগুলোকে নিজেদের মত ব্যাখ্যা করে শুধু কথার মারপ্যাঁচ ও মুখরোচক কথা বলে সবাইকে নিজের নিজের দিকে আনার চেষ্টা করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর এই সাধু সমাজের বিচিত্র আচার ব্যবহার, ধর্ম সম্বন্ধে বিচিত্র ব্যাখ্যা প্রত্যক্ষ করতেন। ধর্ম সম্বন্ধে বিকৃত ব্যাখ্যার প্রতিবাদ স্বরূপ ধর্মের প্রকৃত অর্থ তিনি সমাজের বুকে তুলে ধরেছেন। এর ফলাফল স্বরূপ প্রকৃত যাঁরা সাধু, গুরু, মহান তাঁরা তাঁর তত্ত্বকে সাদরে স্বাগত জানিয়েছেন। আর যাদের স্বার্থে আঘাত লেগেছে, তারা তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছেন, অপবাদ দিয়েছেন, এমনকি হত্যার ষড়যন্ত্র করেছেন। এতদসত্ত্বেও তিনি কোন বিরুদ্ধ শক্তির কাছে নত না হয়ে সমাজের হিতার্থে কখনও ঘরোয়া পরিবেশ, কখনও বা বিভিন্ন জনসভায় ও বেদের সভায় অমৃতময় বেদতত্ত্ব পরিবেশন করেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও নির্দেশমতো তাঁর সেই অমৃতময় বেদতত্ত্ব ছোট ছোট পুস্তিকা আকারে প্রকাশের গুরুদায়িত্ব তাঁরই প্রতিষ্ঠিত **'অভিনব দর্শন'** প্রকাশনের উপর তিনি অর্পন করেছেন। তাঁর ইচ্ছা ও নির্দেশের প্রতি পূর্ণ মর্যাদা জানিয়ে, তাঁর নির্দেশকে শিরোধার্য করে **অভিনব দর্শন** প্রকাশনের ২৭তম শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রকাশিত হল, **'লং পাহাড়ের ডায়েরী'**।

পরিশেষে জানাই, যে সকল ভক্ত ও গুরুগতপ্রাণ ভাইবোন আন্তরিকতার সাথে এই অমৃতময় বেদতত্ত্বের গভীরতা ও মাধুর্য আস্বাদন করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করছেন, তাদের সকলকে জানাই পরম পবিত্র বৈদিক অভিনন্দন **রাম নারায়ণ রাম**।

শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৬
ইং ১৭ই অক্টোবর, ২০০৯

চপল মিত্র
(সংকলক, সংগ্রাহক ও প্রকাশক)

মনের মধ্যে কোন অহমিকাকে স্থান দেবেনা। শুধু জানার আগ্রহে জানতে চাইবে

৯ই এপ্রিল, ১৯৬৭
২৮, শরৎ বোস রোড, কোলকাতা - ২৭

পাহাড়ের সাধকরা শ্রীশ্রীঠাকুরের উদ্দেশ্যে বলছেন, 'আমাদের ঐ একজন মহান ছিলেন। যখন অল্প বয়স, তখন তাঁর সাথে আলাপ হয়'। শ্রীশ্রীঠাকুর ১২-১৩ বছর বয়সে কয়েকবার লং পাহাড়ে গিয়েছিলেন। সেখানে পাহাড়ে কয়েকটি ধর্মসভা হয়। বহু মহান, পণ্ডিত, সাধক উপস্থিত ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকেও নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে একটা পৌরাণিক জায়গায় সবাই আসেন। বহু সাধক, মহান সম্মিলিত হন। ধর্ম সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা শুরু হয়।

প্রত্যেকেই যার যার ধর্মের কথা আলোচনা করেন। নিজের নিজের মতকে বড় করে দেখাতে চান। প্রত্যেকের মতকে বড় করার জন্যই যতরকম কথাবার্ত্তা আলোচনা হচ্ছিল। কেহ প্রতিবাদ করছে না। এরা এমনভাবে বলছেন, 'আমার মতে এই আছে, সেটাই যেন শ্রেষ্ঠ মত'। এদের মধ্যে একজন লং পাহাড়ে থাকেন। তিনি বললেন, 'ভগবানকে আমরা লাভ করবো কিভাবে? শাস্ত্রের যে পথ পদ্ধতি আছে, সেই পথ অনুসরণ করেই আমরা ভগবানকে লাভ করবো।' সাধারণ ভাবের কথা এটা। এর মধ্যে আর একজন বলছেন, 'জপ করতে করতে কাজ হবে'। আর একজন বলছেন, 'আদেশ পেলেই কাজ হবে। কিছুই করতে হবে না'। বিভিন্ন ভাবের কথা। আবার কারও কারও কথার মধ্যে আত্মাভিমান বা অহমিকা ফুটে উঠেছে। তারা বলছেন, 'তাঁদের সব হয়ে গেছে।' এইসব কথাবার্ত্তার মধ্যে কোনটার সঙ্গে কোন মিলতি নেই। কোনটার কোন ঠিক নেই। অথচ এক একজন বিরাট বিরাট পণ্ডিত। পাণ্ডিত্যের খ্যাতি আছে, সবার নাম আছে।

আমি (শ্রীশ্রী ঠাকুর) বললাম, 'পাগলা গারদে এলাম, নাকি?' পাগলা গারদ বলাতে ৪/৫ জন চটে গেছে। আমি কেন পাগলা গারদ বলবো না? কারও বক্তব্যের (মতের) সাথে অন্য কারও মতের মিল নেই। কোন কিছুর মিল নেই। এরা কি চায় জানে না। যার যার ইচ্ছা মতন কথা বলছে। বেশীরভাগই হারা উদ্দেশ্যে চলেছে। একটা সমাধান চাই। ঝগড়া করার জন্য ৭/৮ জন একত্র হয়েছে। আমাকে আক্রমণ করছে। ৩/৪ জন আমার দিকে আসছে বাচ্চা দেখে।

আমি বললাম, দেখ, আমরা এসেছি সমাধান করতে। কিভাবে কাজ করলে সঠিকতার সুরে পৌঁছানো যাবে, সেটাই আগে দেখা দরকার। ভগবান আছে কি নেই, সেটাই আগে জানো। সেটারই সমাধান হলো না, **শুধু কথার মারপ্যাঁচ। মানুষ কি চায় জানে না। বাইরের অনুশাসনে, বাইরের কার্যকলাপে সাধারণ বৃত্তিগুলো হালকাভাবে চলতে থাকে। যার জন্য কোন কিছুতে একনিষ্ঠা নেই, কোনটার মধ্যে স্থিরতা নেই। নিজেদের ভিতরে আস্থা নেই। কাজ করবে কি করে তোমরা?** সবাই চুপ করে শুনছে। এদের মধ্যে একজন মহিলা আছেন। তিনি কোন কথাই বলেন না। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন। 'মা' 'মা' ভাব একটু। তিনি হাসছেন। পাহাড়িয়া, অপূর্ব দেখতে। আমি বললাম, 'তুমি কি বল?' তিনি কিছুই বললেন না। আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন।

আমি বলি, ভগবানরে তোমরা যদি সত্যি জানতে চাও, জানার স্পৃহাতে অগ্রসর হও। সহজসরল মন নিয়ে অগ্রসর হও। প্রকৃতির এমনই নিয়ম, ভূমি উত্তপ্ত হলে চতুর্দিক হতে ঠাণ্ডা বাতাস আসে। কেন বাতাস আসে? নিদাঘের রাগে জল শুকিয়ে যায়। বাতাস এসে পূরণ করে। সত্যসত্যই যদি জানতে চাও, কেন তোমার হবে না? না হওয়ার তো কিছু নেই। অযথা কোন কথার প্রয়োজন নেই। আমাদের জীবনে যা যা প্রয়োজন, সৃষ্টির মাধ্যমে সবই পূরণ হচ্ছে। সৃষ্টির সাথে সাথে পৃথিবীর বুকে যা রয়েছে, চেষ্টা করে কাউকে করতে হয়নি। আমরা সেটা প্রয়োজনে বাড়িয়েছি। যে ধান ছিল, সেই ধানই বাড়িয়েছি। আমাদের

চাহিদার সাথে সাথে চাহিদার প্রয়োজনগুলি এসেছে। আমাদের মন, আমাদের ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধা রয়েছে। সেটা পরিপূরণের জন্য সাথে সাথে জিনিসগুলি রয়েছে। মাতৃগর্ভে শিশুর আগমনের সাথে সাথে স্তনে দুধ আসে। যে স্তনে রক্ত থাকে, সেই স্তনেই দুধ আসে। পৃথিবী মাতার স্তনে যে দুধ, যে বিষয়বস্তু রয়েছে, প্রয়োজনের সাথে সাথে প্রকৃতির মধ্যে প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাথে যোগাযোগ সূত্রে গাঁথা, সেটাই সাধা। প্রকৃতির মানচিত্রে আমরা এটাই উপলব্ধি করছি।

পৃথিবীর মানচিত্র দেখে যেমন ঘোরা যায়; কোথায় সাগর, কোথায় পাহাড় আছে— সব জানতে পারা যায়। আমাদের জীবনের মানচিত্রেও এই জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত রয়েছে। জীবনের চাহিদাগুলি পূরণ করার জন্য দেহবীণাযন্ত্রে যে বৃত্তিগুলো (ইন্দ্রিয়গুলো) রয়েছে, এতে ইঙ্গিতটা কোথায়? তোমাদের মধ্যে সত্যিকারের চাহিদা যদি জাগে, জানবার চাহিদা জাগলেই প্রকৃতির নিয়মে চাহিদার সঙ্গে সঙ্গে তা পূরণ হবে। এই নিয়মেই সব তৈরী রয়েছে। যেটাই চিন্তা করবে, পূরণ হবে। এখন যদি বল, 'কই হচ্ছে?' যে জিনিসই তুমি চাইছো, চাওয়ার সাথে সাথেই তো তা পূরণ হচ্ছে না।

আমি বলবো, 'হ্যাঁ হচ্ছে।' কিভাবে? গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ কর। সৃষ্টবস্তুসমূহের মাধ্যমেই এর উত্তরটা রয়েছে। দেখ, একটা আলু পোঁতা হয় নাই। ঘরের মধ্যে কিছুদিন রেখে দিলে তার ভিতর থেকেই গ্যাজ হয়ে সে বের হচ্ছে। ইঙ্গিত দিচ্ছে, 'এবার আমাকে পোঁত।' নারিকেল বীজ, তার বের হবার সময় হলে তার মধ্যেই সঞ্চিত জল খেয়ে বের হয়ে ইঙ্গিত দিচ্ছে। বলছে, 'এবার আমাকে মাটিতে পুঁতে দাও।' রাঙ্গা আলু তাই বলছে, 'আমাকে পোঁত।' এটার যদি আপন রসে বিকাশ হয়, তবে সৃষ্টির নিয়মে তোমার চাহিদার কেন পূরণ হবে না? এখন বলতে পার, সে তো আপনি যেতে পারছে না। নারিকেলের ভিতর থেকে যে গ্যাজ বেরিয়েছে, সেটা তো চৌকির তলায় রয়েছে। মাটি পেলে তবেই তো সে গজাবে। ফ্লোরে না গজালেও সে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির উপর প্রভাব বিস্তার করছে প্রকৃতির নিয়মে। সে আমাদের ভিতর প্রভাব

বিস্তার করে বলছে, 'আমাকে নিয়ে মাটিতে পুঁতে দাও।' এই যে জানিয়ে দেওয়ার অবস্থা, এই ব্যবস্থাই বড় কথা। চিন্তা করলেই সৃষ্টি হয়ে গেল। এই যে জানিয়ে দিচ্ছে, এটাই প্রকৃতির নিয়ম। প্রকৃতির ইঙ্গিত ধরে ধরে চললেই অপূরণকে পূরণ করার পথে অগ্রসর হতে পারবে।

বাচ্চা শিশু কাঁদলে কোন মা কি স্থির হয়ে বসে থাকতে পারে? মা ছুটে যাচ্ছে। বাচ্চা ডাকছে; 'মা', 'মা' করে কাঁদছে। ওর একডাকে বাড়ীর খুড়িমা, জ্যেঠিমা, বুড়ি ঠাকুমা সবাই তটস্থ। কেহ বলে না, 'বাচ্চা কাঁদুক, আমি যাবো না।' কেউ বাচ্চার উপর রাগ করে থাকতে পারছে না। সবাই ব্যথা পাচ্ছে। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। তোমার ভিতর যদি জানার স্পৃহা, প্রাণের স্পৃহা জাগে, জলের তৃষ্ণা যদি জাগে, তবে তৃষ্ণার সাথে সাথে জল। পান করলেই তৃপ্তি। এইটাই যদি নিয়ম হয়, তবে অভাব যেটা হবে, সেটাই পূরণ হবে। পূরণ যখন হচ্ছে, এটাই যখন নিয়ম; এটাই যদি আমাদের পথ-পদ্ধতি করে নিই, তবে তো কোন অসুবিধা নেই। এটাই আমাদের পথ করে নিতে হবে। আমরা এই বিশ্বজগৎকে জানবো, বুঝবো।

তুমি যদি সবসময় চিন্তা কর, 'আমি জানতে চাই, বুঝতে চাই', তাতে কি হবে? সাথে সাথে যদি চিন্তা আসে, জানতে চাইবো কেন? এই শুরু হয়ে গেল তত্ত্বের অনুসন্ধান। **মনের মধ্যে কোন অহমিকাকে স্থান দেবে না। শুধু জানার আগ্রহে জানতে চাইবে। তোমাদের মধ্যে শুধু সাধনা থাকবে, জানার আগ্রহ থাকবে। অহর্নিশ চিন্তা করবে, 'আমি জানতে চাই, আমি বুঝতে চাই, আমি ভগবানকে জানতে চাই।'** যারা বলবে, 'ভগবানকে বিশ্বাস করি', তাদের হতে দূরে থাকবে। আর যারা বলবে, 'ভগবানকে জানতে চাই', তাদের কাছে যাবে। কারণ একটা ছেলে মারা গেলে, ভগবানকে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও ফটো ফেলে দেয়।

নদীতে ঝড় উঠেছে 'রেখা' লঞ্চ কলাগাছের মতন দুলছে। তখন যাত্রীরা সব ফেলে দিয়ে বয়ার কাছে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। যত ভগবান, দেবতা আছে, সবার নাম করছে। লঞ্চের ভিতর জল ঢুকে পড়েছে। ছেলে মেয়েরা চিৎকার করছে। আমার জামার পকেটে ছিল নীলের

প্যাকেট। মাসিমা দিয়ে দিয়েছিল। আমি জানতাম না। জামার পকেট ভিজে নীল গলে গলে পড়ছে। কয়েকজন কানে আঙুল দিয়ে নামাজ পড়তে শুরু করেছে। আমি বলি, 'আমার ডালের বড়ি ভিজে গেছে কিনা দেখেন তো। নাহলে এক ডালের বড়ির চিন্তায় হয়তো আবার জন্ম নিতে হবে'। একজন আমাকে বলে, 'আপনি এখন ডালের বড়ির চিন্তা করছেন? আপনি কি মানুষ?' ইতিমধ্যে একমাত্র অসুর আর সিংহ ছাড়া সব দেবদেবতার নাম করা হয়ে গেছে। মৃত্যুর চিন্তায় সবাই যখন দিশেহারা, এরমধ্যে আমায় একজন চিনে ফেলেছে। বলছে, 'গোঁসাই, আপনি এখানে? রক্ষা করেন।' লম্বা হয়ে পায়ে পড়েছে। সাথে সাথে অন্যান্যরাও এসে পড়েছে। 'রক্ষা করুন, রক্ষা করুন' চিৎকার উঠছে। যাইহোক, কোনরকমে লঞ্চটা রক্ষা পেয়ে গেছে। সকলের অবস্থা দেখে, জল ছিটিয়ে ঝড়কে শান্ত করলাম। ভগবান যারা বিশ্বাস করে, কেউ মারা গেলে, তারপর লাঠি নেবে।

কৃষ্ণ একজনের বাড়ি গেছে। তাকে খুব যত্ন করেছে। খুব ভালভাবে খাইয়েছে। তারপর ছেলে মারা গেলে ফটো, আসন যা ছিল, সব ফেলে দিল। অবিশ্বাস হলেই আর কাছে যাবে না। আবার অনেকে মনে মনে বিশ্বাস করে। যেমন, মেঘনাদ সাহা, লুকিয়ে প্রণাম করলো। আমার কাছে অনেক কম্যুনিস্ট ছেলে আসে। ভগবান বিশ্বাস করে না। আবার লুকিয়ে প্রণাম করে। কে যে কি মানে বা মানে না, বিশ্বাস করে বা করে না, এদের কারও সঙ্গে আলাপ করবে না। আমাদের কি রকম ভাবে থাকতে হবে জানো? এই যে সূর্য দাউ দাউ করে জ্বলছে। সূর্য কি করছে? জল টানছে। আবার শুঁড় দিয়ে যেন সুন্দরভাবে জল ছিটিয়ে দিচ্ছে, বর্ষণ করছে। **আমাদের দেখতে হবে, সত্যসত্যই আমরা কি চাই। ইন্দ্রিয়ের চাহিদা আছে, তাই পূরণ করছি। ভিতরের বেগ অনুযায়ী আমরা ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধা পূরণ করে যাচ্ছি। কখনো বাথরুমে যাই, কখনও একগ্লাস জল খাই। বৃত্তির নিবৃত্তিকল্পে যখন যে বৃত্তির যেরকম চাহিদা, সে হিসাবে আমরা চলাফেরা করছি এবং চাহিদা পূরণ করে চলেছি।**

ভগবান আছে কি নেই, সেটা দেখার দরকার নেই। আমাদের চক্ষু,

কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ইন্দ্রিয় যে রয়েছে, তা দিয়ে একটা সুন্দর যন্ত্র তৈরী করে পথিক হিসাবে আমরা অগ্রসর হচ্ছি। সত্যিকারের ওজনে সমমাত্রায় সমসুরে চলবো এবং সমসুরে যে চলছি, সেটাকেই বাঁধবো। এটাই জপ, ধ্যান-ধারণা থাকবে। কিভাবে সেটাকে বাঁধবো? এই যে সৃষ্টি, কে করছে? কোথা থেকে আসছে? সব কিছুর মূলকে আমরা খুঁজে বের করবো। তাতেই সবকিছুর সমাধান হবে। এটাই মানতে হবে। যদি বলি, স্বাভাবিক ক্ষেত্রে সব সমাধান হবে কিভাবে? নিয়মের মাধ্যমে যখন সব সমাধান দেখছি, এই সমাধানে বুঝছি, আমাদের চিন্তাধারার সমাধান অনিবার্য। আমরা সেই হিসাবে, সেই মাত্রায় চলবো, এটাই হচ্ছে জপ, তপ, সাধনা। এটাকেই কেন্দ্র করে জীবনের পথে চলতে হবে। এটাই হচ্ছে মন্ত্র; মন্ত্র হচ্ছে সুর, একটা শব্দ, একটা ভাষা। সাগর বলতে গেলে যেমন লক্ষ লক্ষ ঘাটের কথা বলে না। গভর্ণমেন্ট বলতে গেলে যেমন বুঝি, চৌকিদার থেকে ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত সবকিছু নিয়েই গভর্ণমেন্ট। বিরাট বলতে গেলে তেমনি সবকিছু নিয়েই বিরাট। বিরাট কি? যদি একটা একটা করে নাম বলতে যাও, তবে আর কোন শেষ নাই। কোটি কোটি বছরেও শেষ হবে না। এক লক্ষ টাকার চেক পকেটে নিয়ে গেলে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু খুচরা নিতে গেলে বস্তা বোঝাই হয়ে যাবে। রাস্তায় ডাকাতে ধরতে পারে। **বিশ্বের সবকিছু নিয়েই বিরাট। আমাদের চিন্তাধারা সাধারণ জিনিস হতে আসবে। অসাধারণ কিছু হতে আসবে না।**

সৃষ্টির বিষয়বস্তুতে সাধারণ ক্ষেত্রে সাধারণভাবে অতি সহজভাবে যা রয়েছে, সাধারণভাবেই আমরা তা জানতে চাই। এই ফুল কোথা হতে এল? এই ফুলের মূলে কি ছিল? দেখা গেল, এর মূলের মধ্যে বাতাস আছে, তাপ আছে, মাটি আছে। মাটির মধ্যে টক আছে, তিতা আছে, সোনা আছে, হীরা আছে, কত লক্ষ লক্ষ বস্তু আরও আছে, যা আজও বের হয়নি। মাটির মধ্য থেকে ফুলের বীজ ফুটে, অঙ্কুরিত হয়ে বের হয়েছে। তারপর আলো আছে, বাতাস আছে। আবার অনেক পদার্থ নিয়ে বাতাস, অনেক পদার্থ নিয়ে আলো। এইসব নিয়ে একটা ফুল। এইভাবেই সব জিনিস। একটা ফুলের ব্যাখ্যা করতে হলে এক জীবনে

হবে না। কয়েক লক্ষ বছর লাগবে।

এই মাটির মধ্যে এত পদার্থ কি করে এল? এর খোঁজ করতে করতে জানতে হবে, একটা অণু থেকে আর একটা অণু হয়। বাপের বাপ, তার বাপ খুঁজতে খুঁজতে চলেছে। এর ইতিহাস, শেষ বেলায় রেকারিং। প্রত্যেকটি মন্ত্র হচ্ছে অনেক সাড়ার সুর নিয়ে; প্রত্যেকটি মন্ত্র হচ্ছে একটা ধ্বনি। এই **যে মন্ত্রী নির্বাচন করে; লক্ষ লক্ষ মানুষের সম্মতির সুর নিয়ে যেমন একজন দাঁড়ায়, এই মন্ত্রও তেমনই অগণিত লোকের ইচ্ছার, সমস্ত বিষয়বস্তুর সুর নিয়ে এক একটি শব্দ। সা সা রে রে করে যে জন গায়ক হয়ে যায়, সুরজ্ঞ হয়ে যায়, সা-র অর্থ, রে-র অর্থ সে জানে না। এই ধ্বনিগুলো অনেক চিন্তা করে, অনেক চর্চা করে বের করা হয়েছে। সেইসব মহান ঋষিরা মননের সুরে চর্চা করে, অনেক রিসার্চ করে এক একটি ধ্বনিকে মন্ত্ররূপে ব্যবহার করেছেন।** তাঁরা ঠোঙা হিসাবে যা ফেলে দিয়েছেন, তাই দিয়েই এখনকার বিরাট ভাষাবিদ; এখনকার রবীন্দ্রনাথ, সেক্সপীয়ার, এখনকার কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার। এই মহাকবি কালিদাস কিছুই ছিল না। ঐ বেদ, উপনিষদ মুখস্থ করতে করতে বিশ বছর পরে দেখা গেল, তার ভিতরে কাব্যের স্ফূরণ হতে শুরু করেছে। একটা কথা মনে রেখো, পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে অনেক কিছু শিখতে পারা যায়। ব্রিটিশ আমলে মিলিটারীরা ব্যানানা (কলা) ব্যানানা করতো, নানা ইংরেজী কথা বলতো। সেসব শুনে শুনে ফেরিওয়ালারা পর্যন্ত অনেক ইংরেজী শিখে ফেলেছিল। **এই যে নার্সরা, ডোমরা, এরাও অপারেশন করতে পারে। দেখতে দেখতে যে যে বিষয়ে চর্চা করে, সে সেই বিষয়ে মাষ্টার হয়। ডাক্তাররাও ডোমেদের কাছে শেখে। যে যে বিভাগে থাকে, সেখানকার কাজেই দক্ষতা অর্জন করে।** যারা সুরচর্চা করছে, গভীরভাবে চিন্তা করলো, কি করে মূল কয়েকটি ধ্বনির মাধ্যমে সুরকে আয়ত্তে আনা যায়। ধ্বনির চর্চা করে করে সা রে গা মা সরগম তৈরী করলো। আবার ভাষাবিদরা অনেক চিন্তা করে এ.বি.সি.ডি সাজিয়ে নিল। তাঁরা ধ্বনি হতেই সব বের করেছেন। ধ্বনি হচ্ছে নাদ। শব্দ তত্ত্বের থেকে এক এক করে নিয়ে এখানে ওখানে ভাগ করে দিল।

তা না হলে কি নিয়ে থাকবে? সেইগুলো নিয়েই এখানে সব।

এই আলাউদ্দিন (এশিয়ার সুর সম্রাট) প্রথমে ভাল করে ক খ গ ঘ লিখতে পারতো না। এখন একটু শিখেছে। ঢোল বাজাতো। এক বাড়ীতে খড় বিছিয়ে শুতে দিয়েছিল। আর তারের রেওয়াজ করে করে এখন এমন সুরজ্ঞ হয়েছে যে, স্বয়ং প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত তাকে নিজের আসনের পাশে বসায়। ওর বড় ভাই আফ্‌তাবুদ্দিন সা সা রে রে করে করে বিরাট ওস্তাদ হয়ে গেছে। এই ক খ গ ঘ ছত্রিশটা অক্ষরের রেওয়াজ করে করে এক একজন বিরাট কবি, সাহিত্যিক হয়ে গেছে। কাজেই দেখ, ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক শুধু চর্চা করে করে এক একজন বিরাট হয়ে গেছে। বাচ্চা কেবল শ্লেট পেন্সিলে লিখছে আর থুতু দিয়ে মুছছে বা ডাস্টার দিয়ে মুছছে। কেউ বলতে পারবে না, অ, আ বা ক খ-এর অর্থ কি? অর্থ না বুঝেই মুখস্থ করে যাচ্ছে। শিশুবয়সে প্রায় সকলেরই থাকে, কেমনে স্কুলে না যাওয়া হবে, কেমনে ফাঁকি দেওয়া হবে; কেবল পালাবার বুদ্ধি। এটাই যেন নিয়ম। তবুও সবাই বিদ্যা চর্চা করতে করতে চলেছে। এক একজন কত বড় হয়ে গেছে। এই ভাষাবিদ কে? এই শব্দসৃষ্টির মূলে কে? যে শব্দগুলি আছে, আমরা তার থেকেই দু'টো শব্দ বাড়াতে পারি। কিন্তু মূল শব্দগুলি কিভাবে এল? কোত্থেকে এল? কোন্ সুর কিভাবে ভেসে এল? আ কা, ই, আ উ উ, আ কা শিয়াল ডাকে, কুকুর ডাকে। আ কা কা কাক ডাকে। এই ভাষাগুলির মাধ্যমে এক একটি জীব একেকভাবে মনের ভাব প্রকাশ করার চেষ্টা করছে। প্রতিটি ভাষা বিভিন্ন হলেও প্রত্যেকের মধ্যে যোগ আছে, যোগসূত্র আছে। কত রকমের ভাষা আছে। পাহাড় থেকে আরম্ভ হয়েছে। কোথা থেকে টানতে টানতে কোথায় নিয়ে গেছে। নোয়াখালির ভাষা একরকম, চট্টগ্রামের একরকম, বরিশালের একরকম, সিলেটের আরেকরকম। প্রতিটি স্থানের ভাষাই ভিন্ন ভিন্ন— একেকরকমের ভাষা। জঙ্গলে যাও, সেখানে একরকম। সমুদ্রের ধারে যাও, সেখানে আরেকরকম। কুকুর, বিড়াল, হাতী, ঘোড়া— সবের মধ্যেই একটা টিউন (সুর) আছে। দৈহিক বৃত্তি, ব্যথা-বেদনার সুর সকলেরই এক। ভাষার এই বৈচিত্র্য কিভাবে এল? হাত দিয়ে ডাকলে চাইনিজ আসবে,

রাশিয়ান আসবে। ইঙ্গিত দিলে হাতী আসবে, সবাই আসবে। হ্যাট হ্যাট করে পাচন দেখলেই গাভী দৌড় দেবে। আর কাউকে যদি বলি, 'আসেন, বসেন।' শান্তভাবে এসে বসবে।

টিউন (tune) চেঞ্জ হয়। ভাষা একরকমের হলেও সুর সবসময় এক থাকে না। ভৈরবী সুর একরকম; আবার পূরবীর তান আরেকরকম। একটা বিড়াল কাঁদছে; কুকুর কাঁদছে। ব্যথা-বেদনার মূল সুরটি একরকম। একটা রেকর্ডের থালার মধ্যে 'সাঁঝের তারকা আমি' পুরো গানটা রয়েছে। রেকর্ডের থালাটার প্যাঁচের মধ্যে পুরো গানটার সুর ও ভাষা রয়েছে। এই যে আকাশের বুকে বিদ্যুতের রেখা, তার মধ্যে ভাষা আছে। এই মাটির ফাটলের মধ্যে ভাষা আছে। তুমি জল ছিটিয়ে দাও। কাদা কাদা হয়ে যাবে। ফাটলের মধ্যে পড়ে গেলে তোমার পা খোঁড়া হয়ে যাবে। এই বিদ্যুৎ, এই মাটি কত ইঙ্গিত দিচ্ছে। এসব স্টাডি করতে হয়। এসব বুঝবার চেষ্টা করতে হয়। বিদ্যুতের চমকানি, বোবার কথা আর চাইনিজের ভাষা— একই রকম দুর্বোধ্য তোমার কাছে। মেঘের গর্জন, মেঘের গুরু গুরু ধ্বনি, সবই হয় প্রকৃতির নিয়মে। একটা কারণ ছাড়া এখানে কোন জিনিস হয় না। প্রয়োজন ছাড়া, কারণ ছাড়া যখন কোন জিনিস নয়, তবে মেঘের গর্জনে কি রয়েছে? মেঘের গর্জনে যা আছে, একটা শিশুর কান্নার মধ্যেও তা আছে। সেটাতো কোন গোছানো শব্দের মধ্যে নেই। কাজেই প্রকাশ ভঙ্গিমা যদি বাচ্চার এলোমেলো হয়ে থাকে, তবে তোমার মধ্যে এলোমেলো ভাব কেন থাকবে না? এলোমেলোর মধ্যে থেকে, রোগ, শোক, কান্নার মধ্য দিয়ে কোন্ রাগিনীর সুর ফুটে উঠছে? মেঘের গর্জনে গুরু গুরু ধ্বনি হচ্ছে। কোন্ রাগিনীর সুরে এই গর্জন হচ্ছে? আমরা যে মাতৃগর্ভ হতে এসেছি, কোন্ রাগিনীর সুরে আমরা ছিলাম? এখন এই যে ১৬ মাত্রায় চলেছে, তা ধিন্ ধিন্ না চলেছে, তাতে সেই রাগের (রাগ-রাগিনীর) মধ্যে কিছু কি বুঝা যায় না?

এই যে বিদ্যুতের চমকানি, এই যে অঝোর ধারায় বারিবর্ষণ, কি অদ্ভুত। শুধু কবিতা লিখলেই হবে না। প্রকৃতির বিভিন্ন বিষয়বস্তু নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে। চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বুঝে নেন। এসব

বুঝতে গেলে প্রকৃতির সুরে সুরময় হতে হবে; বিবেকের পিন লাগাতে হবে। সেই যে নাদ, সেই যে ধ্বনি, সেই রাগিনীর বোল তোমার মধ্যে যখন বোল দেবে, তখন বুঝতে আর কোন অসুবিধা হবে না। এই যে সবসময় সাগরের ফোঁসফোঁসানি চলছে, ঢেউয়ের পরে ঢেউ চলছে, বাতাসের শোঁ শোঁ ধ্বনি চলছে, এরা কোন্ বার্তা বহন করছে? সেই বার্তা নিয়ে এস। এই বোল তুমি জানো না। কিন্তু সাগরের সাথে তোমার যোগ আছে। গরমে ঘামের সাথে এখনও তোমার গা থেকে নুন বের হয়। তোমার পূর্বপুরুষ এই আকাশ, বাতাস, গাছপালা উপভোগ করে গেছে। আমি যে দিকে তাকাই, আমাকেই খুঁজে পাই। গাছপালা খেয়ে আমরা মানুষ। গাছ কি বলতে চায়, বুঝতে চেষ্টা কর। একই আসনে দাঁড়িয়ে থেকে হাজার বছর কাটিয়ে যাচ্ছে। আমাদের উপকার করছে। কাজেই গাছের বার্তা তুমি জানবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তুমি তার বার্তা জানলে না। বৃষ্টির ফোঁটায় ফোঁটায় গজিয়ে ওঠে গাছের গোড়া। **বুঝতে না পেরে বড় বড় বোল আওড়ালে চলবে না। ওটা টেবিল চাপড়ানোর সামিল। চায়ের টেবিলে তুফান তুলে হিটলার, চার্চিল, মুসোলিনির নামে এমন টেবিল চাপড়ালে যে, রেস্টুরেন্টে চায়ের কাপ ডিস ভেঙে গেল।**

তাহলে সঠিক বোল জানার পথ কি? পথটা কোথায়? আমাদের চক্ষের সামনেই রয়েছে প্রকৃতির ইঙ্গিত। কোন জায়গায় বেশী গরম পড়েছে। তারপর ঝড় হচ্ছে। আগমনীর ডাক নিয়ে আসছে। তুমি ভিতরে তন্ময়তা আন, গভীরতায় যাও। তারজন্যই মন্ত্র। প্রথমে 'সা' ছাড়া সুর হয় না। তারপর 'সা' ও 'গা' থাকে না। 'সা'-ও নেই, 'গা'-ও নেই। উচ্চাঙ্গসঙ্গীতে সুরের খেলা চলেছে। সুরের রেশ চলেছে ভিতরে ভিতরে। তারপর চলছে ত্যানা ত্যানা। তারপর হাঁ করে আছে। কোন আওয়াজ নেই। ঐ ব্যাটা তবলচিও তবলা নিয়ে বসে রইল এক ঘণ্টা। প্রায় দু'ঘণ্টা পরে ওস্তাদের গলায় বের হ'ল হুম্। তবলচিও সাথে সাথে তবলায় টোকা দিল। দু'জনে সঙ্গম হচ্ছে। প্রাণের সাথে প্রাণের মিলতি হচ্ছে। আবার কোন শব্দ নেই। চলছে কিন্তু সুর। ভিতরের সুরকে আকাশে বাতাসে ছেড়ে দেয়। যেমন হাউই বাজির

পিছনে একটু আগুন দিয়ে মনে হয়, সাঁ করে আকাশের সাথে কি যেন মিশে গেল। এই সূচনা চলেছে। অনেকে আবার রেওয়াজের (চর্চার) গভীরতায় যেতে চায় না। আধুনিক গান দিয়ে প্রথমেই শুরু করে; তুমি আমি, আমি তুমি। কয়েকখানা আধুনিক গান শিখেই গায়ক গায়িকা হতে চায়। এই নাম, যশের চিন্তায় কাজ করলে হবে না। গভীরতায় যেতে হবে। গভীর চিন্তায় তন্ময় হতে হবে। প্রথমে শুক্‌তানি দিয়ে শুরু করলো। তারপর নানা পদ পরিবেশন করে মুখশুদ্ধি দিয়ে ছেড়ে দিল। তখন আর লবঙ্গ পায়নি বলে মেজাজ হবে না। সুরের রেওয়াজের গভীরতায় যেতে যেতে দেখবে, চারিদিকে সব সুরময় হয়ে গেছে; আকাশ হয়ে গেছে, মাটি হয়ে গেছে। সব কিছু আকাশের সাথে মিশে গেছে।

সর্বাবস্থায় তাকিয়ে দেখ, কোন কিছুর রূপ নাই। সব রূপ যেন অরূপে বিলীন হয়ে গেছে। **এতবড় বিশ্বপ্রেমিক চামড়া বাদ দিলে প্রেম ছুটে যাবে। তত্ত্বজ্ঞ রক্ত থেকে শিরা উপশিরায় গেল। রক্ত কণিকায় গেল। আরও কণিকাতে গেল। অণুপরমাণুতে চলে গেল। দেহের ভিতরে রক্ত মাংস,লিভার, পাকস্থলী, স্টমাক, গলব্লাডার দেখলে আর কোন আকর্ষণ থাকে না। কোন প্রেম থাকবে না।** এখন বুঝছো তো, সব কিছু সুরের ঢেউ, সাগরের ঢেউ। সাগর থেকেই সবের উৎপত্তি। তোমরা সাগরের ঢেউয়ের সঙ্গে মিশে যাও। দেখতে দেখতে দেখা যায়, পাহাড়ের পর পাহাড়; পাহাড়ের ঢেউ। সাগরের ঢেউ আর পাহাড়ের ঢেউ, এই দুই ঢেউ-এর মাঝে তোমরা লীন হয়ে যাও। আসার নিয়ম পদ্ধতিতে যেমনি সব এসেছে, তেমনি সব আসবে। তোমার মধ্যে যখন তোমার চাহিদা আসবে, আপনি পূরণের সুরে পূর্ণ হতে থাকবে। কোন চিন্তা নেই। সঠিক পথের সন্ধান তখনই যে পাবে। আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

আমাদের আজ্ঞাচক্র শুধু দুই নেত্রের মাঝখানেই নয়, সমস্ত আকাশটাই আজ্ঞাচক্র

১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬
পাম এ্যাভিনিউ, কলকাতা

এক মহান অষ্টসিদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি চক্র নিয়ে আলাপ করছিলেন। তিনি তাঁর ভক্তদের চক্র সম্বন্ধে বুঝাচ্ছিলেন। তখন আমার বয়স ১১/১২ বৎসর। সেখানে আরও কয়েকজন মহান উপস্থিত ছিলেন লং পাহাড়ের গায়ে। আজ্ঞাচক্র ও সহস্রারের কথা আলাপ হয়েছিল। তাঁর ভক্তরা মণিপুর, অনাহত ও বিশুদ্ধ অতিক্রম করে আজ্ঞাতে গিয়ে পৌঁছেছে। আর যিনি গুরু তিনি এটাও (আজ্ঞাচক্র) ছাড়িয়েছেন, ওটাও (সহস্রার) ছাড়িয়েছেন। আরও কয়েকজন ছিলেন, তাঁরাও অনেকটা কাছাকাছি। একটা সভা হচ্ছিল; বেশ অন্তরঙ্গ সভা।

প্রত্যেকে জিজ্ঞাসা করছে, 'প্রভু, আজ্ঞাচক্র কিভাবে ফুটবে? আজ্ঞাচক্রে কি কি আছে? এখানে (আজ্ঞাচক্রে) স্মরণ করলে কোথা থেকে কি সুর ভেসে আসে, তুমি আমাদের শোনাও।'

পাশে আর একজন মহান বললেন, এই মধুময় বাণী, আজ্ঞাচক্র আর সহস্রারের কথা উনি বলবেন। আমি পাশে ছিলাম। তখন বলি, 'এই আজ্ঞাচক্রের বাণী মধুময় কথা, সুন্দর কথা; যে কথা শুনলে আর কোন কথা শুনবার দরকার হয় না। শুনলেই ফুটে উঠবে। সবার ভিতর জেগে উঠুক'।

যিনি অষ্টসিদ্ধিসম্পন্ন মহান তিনি তখন বললেন, আজ্ঞাচক্র অদ্ভুত জিনিস। আজ্ঞাচক্রে চিন্তার সাথে সাথে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। এই **আজ্ঞাচক্রে মন রাখলে বুঝুক বা না বুঝুক সৃষ্টি হতে থাকে। সৃষ্টি বুঝা বা না বুঝার জন্য অপেক্ষা করে না। মনটা আজ্ঞাচক্রে** যায় কিরকম? খালের জল যেমন নদীতে যায়। **নদীর জল সাগরে পৌঁছায়; সেইরূপ**

মন এখানে (আজ্ঞাচক্রে) রাখলে প্রচণ্ড তাপে লৌহ গলে যেমন জল হয়, সেভাবে দেহ বা মন গলে সাগরে পৌঁছে মিশে যায়। সবসময় যে বসে নিবিষ্ট চিত্তে কাজ করতে হবে, তা নয়। রাস্তায়, ঘাটে, মাঠে, হাটে, বাজারেও কাজ হতে পারে। তিনি আরও বললেন, বাস্তব জগতে বাতাসে আলোতে যেমন সুর বয়ে যাচ্ছে, সেভাবে অনর্গল বয়ে যাচ্ছে এই বিন্দুতে, আজ্ঞাচক্রে। কিভাবে কোন্ কেন্দ্রে চিন্তা করলে তাঁকে অতি সহজে পাওয়া যায়, সেটাই আলোচ্য বিষয়। দুঃসাধ্য বস্তুও অতি সহজে যাতে লাভ করা যায়, তারজন্যই আজ্ঞাচক্রের ধ্যান, আজ্ঞাচক্রের সাধনা। এতে যেকোন জিনিস উপলব্ধি করা যায়, যেকোন ব্যক্তি সহজে উপলব্ধি করতে পারবে। কেন পারছে না? দরজা না জানার জন্য। অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে যেমন দরজায় হাত পড়ে এবং খুলে যায়, তেমনি জানা না থাকলেও একদিন না একদিন আমাদেরও দরজাতে হাত পড়বেই এবং খুলবেই। এই আজ্ঞাচক্র এমন জিনিস, যেকোন সময় এর চিন্তা করলে এতে অদ্ভুত সৃষ্টি হয়। এইরকমভাবে আর একজন বললেন। দ্বিতীয় ব্যক্তির কথাও অনেকটা এইরকম। তখন আমাকে বলেন, 'তুমি বল।'

আমি বলি, আমার কথা তো তোমাদের শাস্ত্রের সঙ্গে মিলবে না। আমি একেবারে ভিতরের, অন্তরের কথা বলবো। আমাদের আজ্ঞাচক্র শুধু দুই নেত্রের মাঝখানেই নয়, কপালেই নয়; সমস্ত আকাশটাই আজ্ঞাচক্র। আকাশে স্থিত সবাই। যারা আলো খুঁজতে চায়, যারা আলোর দিশারী, মহাকাশেই সন্ধানে রত। **ত্রিনেত্রে দেবী দুর্গাকে ফোঁটা দেয়। এই জায়গায় সিন্দুর দেয় কেন? এটি যোগাযোগ কেন্দ্র। চক্রগুলোর চিহ্নস্বরূপ, চিহ্ন হিসাবে ফোঁটা দেওয়া হয়। সেইজন্য আজ্ঞাচক্রের উদ্দেশ্যে এই ফোঁটা, যাতে নিজের মধ্যে নিজেকে আকর্ষণ করতে পারে। বিবাহ হলেই সিন্দুর দেয়। প্রকৃতি এবং পুরুষের সমন্বয় করানোর জন্য এখানেই যোগাযোগের কেন্দ্রবিন্দু। শিবশক্তির যোগবিন্দুই এখানে। শিব এবং শক্তির পরম যোগকে স্মরণ করবার জন্যই এই সিন্দুর, যাতে স্বামীকে অমরত্বে রাখা যায়, যাতে চিরকালের জন্য অমরত্ব লাভ করা যায়, শিবত্ব লাভ করা যায়।** সিন্দুর এখানেই শেষ

করলো না। শেষ অবধি সিঁথি পর্যন্ত টেনে দিল কেন? যেখানে গেলে সব পাওয়া যায় অর্থাৎ আমাদের জীবনের যত কিছু আকর্ষণ এখানে উঠলে শেষ হয়। এই আজ্ঞাচক্র চিন্তা করলে, এখানে চিন্তা করলে সব চাওয়া পাওয়া শেষ হয়ে যায়। আমাদের মাথার উপরে আকাশ। এই আকাশ এত বিরাট, এত ব্যাপক যে সীমাহীন, অশেষ, অনন্ত। আকাশকে আজ্ঞাচক্র চিন্তা করলে এখানেই সবকিছু রয়েছে। সাধককে বললাম, চেষ্টা করে মনকে আয়ত্তে আনতে হলে অনেকেই বুঝবে না। কি করে আনবে, কত সময় লাগবে? নানা জিজ্ঞাসা আসবে। সাধারণভাবে এটুকু বুঝে নেওয়াই ভাল যে, আমরা আজ্ঞাচক্রেই ডুবে আছি। এখানে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা, সহস্রার— সপ্ত চক্রের সপ্তসুর সবই আছে; কারণ আমরা যখন আকাশে বিরাজ করছি, আকাশস্থিত মন আমাদের, তার মধ্যে যখন ডুবে আছি, তখন সবকিছুই ভরপুর হয়ে রয়েছে। তাই আলাদা কি আবার চেষ্টা করবে? প্রয়োজন আছে?

সাধক বলছেন, তবে চিন্তা না করলে জাগবে কি করে?

আমি বলি, সিংহ শাবক মেষের দলে রয়েছে। তার সিংহত্ব তো নষ্ট হয় নাই। এক ফোঁটা রক্তের স্বাদ পেয়েই সিংহত্ব তার জেগে উঠলো। তার স্মরণে এলো, সে সিংহ। **আমাদের মধ্যে সিংহত্ব বিরাটত্ব যে আছে, তার ইঙ্গিত এই এতবড় সিন্দুরের ফোঁটা। আকাশে এই সিন্দুরের ফোঁটা যখন লীন হয়, আকাশের রঙে মিশে যায়। সিন্দুরের ফোঁটা যখন জ্যোতি হয়, প্রজ্জ্বলিত হয় দাউদাউ করে, পূবাকাশে যখন জেগে ওঠে, সহজেই বুঝতে পারি, আমাদের মন, প্রাণ, অন্তর, আমাদের সবকিছু স্মরণের পথে রয়েছে।** সেই বিন্দু, সেই বিন্দুর উদ্দেশ্যে ছন্নছাড়া হয়ে, বেদিশ হয়ে আমরা ঘুরছি। সেই মূল্যবান জ্যোতিষ্ক কোথায়? অতি সহজ বস্তুতেই রয়েছে সহজভাবে। অত চিন্তা করে সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নেই। **যেই জল একটু খুঁড়লেই পাওয়া যায়, সেই জলের জন্য আকাশপানে তাকিয়ে থাকার প্রয়োজন হয় না। জল রয়েছে আমাদের পথের তলায়।** যে চিন্তায় ভগবান হয়েছে, বিরাট হয়েছে, অবতার হয়েছে, পূর্ণ হয়েছে, খুঁজতে খুঁজতে তাঁরা হারিয়ে

যায়নি। আমাদের চোখের সামনে আমাদের সাধনার ইঙ্গিত রয়েছে। আকাশে সব এমন সুন্দরভাবে সুসজ্জিত হয়ে রয়েছে যে, আমাদের সাধনার বিরাট পুরুষ, বিরাট সত্তা নিজেকে নিজে ধরা দেবার জন্য এই পূর্বাকাশে জেগে ওঠে। সূর্যোদয়ের পূর্বে যে আলোর আভাষ, সেটা শুধু আলো দেবার জন্য নয়। আমাদের চিন্তাধারাকে সহজ করার জন্য এই আভাষ আরও বেশী সাহায্য করছে, আমাদের সাধনার সহায়তা করতে সাহায্য করছে।

আরও রয়েছে লক্ষ লক্ষ গ্রহ, উপগ্রহ। আমাদের দেহের এই রক্ত কণিকাগুলো যে একদিন গ্রহ, উপগ্রহ হতে পারে, তারই সাড়া আমাদের এই দেহের যন্ত্রে রয়েছে। আমাদের দেহের ভিতরকার যন্ত্রে কোথায় কি আছে, তার দিকে না তাকিয়ে যদি বাইরে ছেড়ে দাও, দেখবে গ্রহে, উপগ্রহে, আকাশে বাতাসে সর্বত্র নিজেরই রূপ। তোমারই রূপ বিরাজ করছে সর্ব সত্তায়। এই রক্ত, মাংসের ভিতরে তা খুঁজে পাওয়া যায় না। আবার খোঁজ যখন রয়েছে আমাদের মূলাধারে, আজ্ঞাচক্রে, সহস্রারে, তখন বুঝে নিতে হবে, আকাশে বাতাসে জলে স্থলে সব জায়গায় রয়েছে, এই চক্রেরই রূপ। আমাদের যা কিছু রয়েছে অন্যরূপে। এই রূপগুলোর পরিবর্ত্তন হলেও সব কিন্তু রক্ত কণিকারই রূপ। এই কণিকা থেকেই সূর্য সৃষ্টি হয়েছে, পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে। এই কণিকা হতে ক্রমশঃ আবর্ত্তনে বিবর্ত্তনে দ্রুতগতির গতি অনুযায়ী সমস্ত অণুগুলি প্রজ্জ্বলিত হয়ে চলছে। সেই স্ফূরণে সব কিছু প্রকাশিত হয়ে যাচ্ছে। এর ফলেই এই জগতের রূপ, সকলকার রূপ।

আমাদের মধ্যে সূর্য আছে বীজাকারে। সূর্যের বীজ, চন্দ্রের বীজ— ডালার মধ্যে শতেকরকম বীজ থাকে। অনেকেই জানে না, কোন্‌টা সরিষার বীজ, কোনটা ডাঁটার বীজ, যদিও এক জায়গায়ই থাকে। পোঁতার পর যার যার চেহারা নিয়ে বের হয়। যত বন্ধুত্বই থাক, যার যার চেহারা নিয়েই বের হয় পোঁতার পর। আমাদের মধ্যে যে রক্ত কণিকাগুলি, এতে সূর্যের বীজ, চন্দ্রের বীজ, গ্রহ উপগ্রহের বীজ বিভিন্ন আকারে দেহের থলিতে (দেহবীণাযন্ত্রে) রয়েছে। কোন্‌টা রক্ত, কোন্‌টা বীর্য, এগুলোর যে বিকাশ, এগুলো যে ফুটবে, তা কি করে বুঝবে? তুমি

যখন ঐ রূপ থেকে এসেছ, চেয়ে দেখ, **তোমার মধ্যে গ্রহের বীজ আছে, তোমার মধ্যে পৃথিবীর বীজ আছে। সূর্য দেখছো পূর্বাকাশে। তুমি এতটুকু হলেও জগতের সব বীজ নিয়ে বসে আছ।** বীজ থাকলেই বীজের নিয়মে ফুটে ওঠে। তোমরা আকাশের দিকে চেয়ে দেখ, এই আকাশ বাতাস সবতো তোমারই রূপ। তোমার রূপ যে আকাশ বাতাস, তুমি যখন তোমাকে খুঁজতে যাবে, নিজেই বিস্মিত হবে। এতগুলি রূপে যে রূপান্তরিত হয়েছো, এ সবই যে তোমারই রূপ, তোমার সত্তায় সবকিছু রয়েছে।

আমি যখন ভাববো, সমস্ত সত্তার সাথে লীন হয়ে আছি। আমি সমস্ত সত্তায় রূপান্তরিত হয়ে চলেছি। একবার গাছ হয়ে, একবার বীজ হয়ে, একবার আকাশ হয়ে রয়েছি, কত সুন্দর হবে বলতো। বিশ্ববিরাটের সত্তার সাথে আমার সত্তা এক হয়ে গেছে।

সাধক বলছেন, এভাবে সবসময় চিন্তা করা কি সম্ভবপর?

আমি বলি, যখন যেখানে আছ, সেটা বোঝ কি না? রাস্তায় থাকলে বুঝলে রাস্তায় আছি। কে না বুঝে জলে ভিজছে, রৌদ্রে পুড়ছে? আমরা যদি বুঝে নিই, আমরা আকাশে আছি, আমরা পৃথিবীতে আছি, আমরা উদ্ভিদে আছি, আমরা জলে আছি। আমরা যদি ভেবে নিই, সমস্ত রূপে আমরা; আমরা যদি বুঝে নিই, সমস্ত আকাশের সাথে একরূপ হয়ে আছি, অসুবিধা কোথায়? এতটুকু বীজ থেকে কত বড় গাছ হয়। এই যে টক টক করছে, নাড়িতে যে স্পন্দন হচ্ছে, স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, 'আমি আছি।' মানে এক গতির সাথে গতিময় হয়ে যে ঘুরে চলেছে, সেই গতিটাই দরকার। গতির গতিটা এক গতি ধরে বুঝে নিতে হবে, কোন্ গতিতে নাড়িটা চলছে। **রক্ত এই ধারাবাহিকভাবে চলে কি করে? চলে এই অনন্ত গতির সাথে যুক্ত আছে বলেই। দেহের সমস্ত অঙ্গ দর্পণ স্বরূপ। জিহ্বায় ব্যাটারী চার্জ করলে চুল, কান, নাক, চক্ষু— সবই চার্জ্‌ড্ হয়ে যায়। এরা সবাই দেখছে, প্রতিটি ইন্দ্রিয়ই স্বাদ গ্রহণ করছে। এইসবকে জীবিত অবস্থায় জীবন্ত করে রেখেছে।**

আমাদের মধ্যে উদ্ভিদ আছে, গাছ-গাছড়া, জল, সাগর সব

আছে। এই যে রয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত, তার সঙ্গে কিছু কিছু মিলতি আছে, ওর (সূর্যের) সাথে। এই যে শরীরের তাপ ৯৭°/৯৮° ডিগ্রী; এই যে তাপ, এই তাপটা কে রক্ষা করছে? রক্ষা করছে কে? বাতাসে না জলে, কোথায় আছে এই তাপ? এই তাপ পেটে মানে ভিতরে ১০৪°/১০৫° ডিগ্রী। এতে আগুন জ্বলে। কোন্ সূর্য এর মধ্যে লুকিয়ে আছে? সূর্যের বীজ আছে বলেই, সূর্যের সঙ্গে যুক্ত আছে বলেই, জলের সঙ্গে যুক্ত আছে বলেই, বাতাসের সঙ্গে যুক্ত আছে বলেই, সবগুলো এক বন্ধনে একত্রিত হয়ে রয়েছে। আমাদের মধ্যে যে জল আছে, আমাদের দেহস্থিত জলের পরিমাণ নেহাত কম নয়। একমণ শরীরে ১৫/২০ সের জল নিয়ে আমরা দৌড়াদৌড়ি করছি। সাগরের জল পৃথিবীর তুলনায় ১৫ সের। অনেক প্রাণী আছে ১৫ সের জল, তাদের কাছে সাগর। কাজেই আমাদের মধ্যে সাগর রয়েছে। নাক দিয়ে যে বাতাস বয়ে যাচ্ছে, অন্যের (অন্য প্রাণীর) কাছে সেটাই ঝড়। বীজ আকারে যে রয়েছে, তার ইঙ্গিত চোখে দেখা, কানে শোনা। এসব আলোরই আভাষ। ঐ রূপের সঙ্গে এই যে রূপ যুক্ত আছে, বীজ আকারে আছে, তা অতিসহজে উপলব্ধি করতে পারি। যে বীজ শেফালী ফুলের, তা হতেই গাছ হয়। যে বীজ হতে আমরা ছিটকে ছিটকে পড়ে আছি, চোখে দেখছি, কানে শুনছি, সেগুলি এখন চারাগাছ হয়ে গেছে। তাদের বাইরের আলোর সাথে মিশাতে হয়। চারাগাছ আলো চায়, বাতাস চায়। কেন চায়? কারা এই চাওয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত রয়েছে? আমরা যদি চিন্তা করি, সহজেই বুঝে নিতে পারি।

আমরা যখন আজ্ঞাচক্রে, সহস্রার চক্রে বিভোর হয়ে ডুবে আছি, আমরা মুক্তভাবে চিন্তা যখন করছি, আমাদের বিবেক বৈরাগ্যের লতা, আমাদের চিন্তাধারা সেই ধারায় ধারাবাহিকভাবে চলে যাবে। আমরা আকাশকে চক্র বলে যদি ভেবে নিই, নতুন করে চিন্তার আর প্রয়োজন হয় না। তারজন্যই মন্ত্র। চিন্তা করার সাথে সাথেই ফুটে ওঠে। 'আছে' জিনিসটাই বারবার বলতে হয়। অতি অদ্ভুত। তোমরা বসে বসে একটু চিন্তা কর, মাঝে মাঝে মনে হবে, হারিয়ে গেছ। মাঝে মাঝে দেখবে, সাগরের ঝাপ্টা। একজনকে বলেছিলাম, সাগর চিন্তা করতে।

সে শোঁ শোঁ করে ঢেউয়ের বাড়ি খায়। ভয় পেয়ে গেছে। তার স্ত্রীকে বলে, 'তুমি বসো।' তারপর দেখে সূর্য লাল হয়ে উঠছে সাগর হতে। দেখ, আজ্ঞাচক্রের কি অদ্ভুত বিকাশ হচ্ছে। এমন আলো পড়েছে, তাকাতে পারছে না।

স্ত্রী জিজ্ঞাসা করে, 'তোমার কি হয়েছে?' সে বলে, 'কিছু হয়নি। পাগল হয়ে যাইনি। ধূপ ধুনাটা জ্বালাও না।'

সে চোখের সামনে দেখছে, সূর্যের আলো, পুরীর সমুদ্রের ঢেউ। হঠাৎ চিন্তা করছে, 'আচ্ছা দেখি, ঠাকুরকে দেখা যায় কিনা।'

হঠাৎ দেখে, দূর থেকে মহাদেব আসছে। যার যা দেখা অভ্যাস। মহাদেব দাঁড়িয়ে গেছেন সামনে। মহাদেব বলছেন, 'তুই কি চাস?'

সে বলে, 'আমি যেন গুরুগতপ্রাণ হতে পারি।'

তথাস্তু। মহাদেব চলে গেলেন।

সে উঠছে, বিশ্রাম করছে। আবার বসছে। এরকম হতে বেশীদিন লাগে না। একটু চিন্তা করলেই হয়ে যায়। দেখ, লেন্সে একটা ক্যামেরাতে ছবি ওঠে। যেরকমভাবেই বসে পড়, তাই উঠে যাচ্ছে। একটা ছায়া পড়েছে, তাকে কিভাবে আটকিয়ে ফেলেছে। এটা মন থেকে মনন করেই আবিষ্কার করেছে। খুব দামী লেন্স-এর ক্যামেরায় ছবিও ভাল ওঠে। আর এটা জীবন্ত। **আজ্ঞাচক্রের যে ক্ষমতা, এর পাওয়ার সীমাহীন। এটার মধ্যে যদি কোনরকমে মনকে ফেলতে পার, এটা যা দেখবে, সেই রকমটি হবেই। তাতে কি আনন্দ লাগবে। বিভোর হয়ে যাবে।** চিন্তায় দেখে প্রথম। তারপর আস্তে আস্তে রূপ দিতে আরম্ভ করে। শুয়ে চিন্তা করতে করতে ঘুমাবে। দেখবে, গতিবিধিই তোমাদের অন্যরকম করে ফেলবে। যাক্ তোমরা সঙঘবদ্ধ হয়ে থাকবে। বড় দুর্দিন আসছে।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

বাইরের কোন কিছু দেখে গুরুকে বিচার করবে না। দেখবে, কোন সময় তোমায় টেনে নিয়ে যাচ্ছেন

৬ই অক্টোবর, ১৯৬৬
পাম এ্যাভিনিউ, কলকাতা

আজ থেকে মনে কর, প্রায় ৩০ বছর আগের কথা বলছি। এক পাহাড়ে সভাতে গিয়েছিলাম। সেই সভাতে অনেক লোক এসেছিল। অনেক পণ্ডিতও এসেছিলেন। সেখানে আলোচনা হয়েছিল। আলোচনার কোন নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু ছিল না যে, এই বিষয়ে আলোচনা হবে। তবে যে যার খুশীমত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছিল। যেমন, কি করে মন স্থির হয়? কি করে ভগবানকে ডাকা যায়? ইত্যাদি ইত্যাদি। একজন পাঠক ছিল সেখানে। সে গ্রন্থ হতে কিছু কিছু উত্তর দিচ্ছিল। তখন তারা বলেছে, 'গ্রন্থের থেকে আমরা জানতে চাই না। এখানকার কি আছে, তা জানতে চাই।' আর একজন সাধু বলেছে, 'আমাদের মন চঞ্চল। মন কি করে স্থির করা যায়?' মন একটি বিন্দুতে কেন্দ্র করলে, আজ্ঞাচক্রে মন নিবিষ্ট করলেই স্থির হয়। সহজভাবে এক উত্তর।

প্রঃ— রাগ কি করে যাবে?

উঃ— ওগুলো থাকবেই।

প্রঃ— যখন জপ করতে বসি, মন বসে না।

উঃ— ঐভাবেই করেন। আস্তে আস্তে হবে। পূর্ব জন্মের

ব্যাপার।

আমি পাশে বসেছিলাম। বললাম, এটা কিরকম উত্তর হল? মামুলী কথা বলে যাচ্ছেন। আমাদের চলার পথে যে বিঘ্ন বা জটিল ব্যাপার আছে, তা হতে কিভাবে উদ্ধার পাওয়া যায়, তাই বলুন। 'শুধু চেষ্টা করুন', বললেই হল না। ইচ্ছামতন 'ছাড়ার চেষ্টা কর আর ধরার চেষ্টা কর', বললে কি করে হবে? এসব কথার কোন আগা মাথা নাই। তাই কোন কাজে লাগে না। আমাদের ভিতর থেকে কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি ইন্দ্রিয় বৃত্তিগুলির উদ্ভব হওয়াটা যেমন নিয়ম, ঠিক তেমনই যাওয়ার পথও আছে। যে জিনিস ভিতর থেকে উদ্ভব হয়, সেটা ত্যাগ করবার বিষয় ভিতর থেকেই আসবে। জোর করে ত্যাগ করার কি আছে? কেহ তো বলে না, 'একটা হাত কেটে ফেলুন। দুটো যখন আছে, একটা ত্যাগ করে দিন।' এটা কিরকম কথা? যদি ত্যাগ করার কথা থাকে, ত্যাগ যা করার সৃষ্টি হতেই হয়ে আসবে। বসে বসে 'ত্যাগ করবো', 'ত্যাগ করবো,' বললেই হয়ে যাবে? ভিতর হতে যা জাগছে, যাওয়ার হলে আপনিই যাবে। এটা অন্তরায় নয়। ঐসব আমাদের সহযোগিতার মধ্যে যে না রয়েছে, তা কে বলবে? সৃষ্টির নিয়মে প্রয়োজনেই সব জিনিসের উদ্ভব হয়। শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সৃষ্টির প্রয়োজনেই হয়।

আমাদের দেহের ভিতর হতে যদি জাগে কোন কিছু, আমরা যদি মনে করি, এগুলোকে বিঘ্ন, সেটা নিজেদের কথা, তা ধরবো কেন? শাস্ত্র কোন্‌গুলো?

— ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা প্রত্যক্ষ করা যায়, তাহাই শাস্ত্র। চোখ, মুখ, নাক, কান দিয়ে যা প্রত্যক্ষ করবে, যা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করবে, তাহাই শাস্ত্র। যারা পণ্ডিত হয়েছেন, গ্রন্থ পাঠ করেই হয়েছেন। কাজেই তোমার গ্রন্থ তুমি পাঠ করে নাও। না জেনে তত্ত্ব বলছো কেন? আগে দেখ, এটা আমাদের প্রয়োজনের মধ্যে আছে কি না? ত্যাগ করার কিছু আছে কিনা? তুমি কি ত্যাগ করতে পেরেছ, বল? অনেকে বলে,

'আমরা কাম, ক্রোধ ত্যাগ করতে চাই।' দেহটাই তো ত্যাগ করবো। দেহের সাথে সাথে সবই ত্যাগ হয়ে যাবে। সেখানে আলাদা করে ত্যাগের চিন্তা করার কি দরকার?

একটা চিমটি দিলে, করে উঠি উঃ। সৃষ্টির নিয়মে 'উঃ' টাই মাত্রা, 'উঃ' টাই ধর্ম। উঃ না করা পর্যন্ত ব্যথা দিয়ে যাবে। একটা লোককে জোরে চাপ দিলে 'উঃ' করলে ছেড়ে দিই। ওটাই মাত্রা। ব্যথা থাকবে, দুঃখ থাকবে। লোভ আছে বলেই তো লোভের সামগ্রী তৈরী করার বুদ্ধি আসে। একজনে আনে, পাঁচজনে খায়। ভিতরে লোভের উদ্ভব হলে কি হবে? এক টুকরো, দুই টুকরো করে আমাদের লোভের যন্ত্রটা জানার আগ্রহে, উন্নতির আগ্রহে অগ্রসর হচ্ছে। মাছগুলি হাঁ করে এটা খেতে চায়, সেটা খেতে চায়। খেয়ে গিয়ে পালাচ্ছে। কাজেই জাল তৈরী কর, বৈঠা তৈরী কর, বন্দুক তৈরী কর। আরও কিছু তৈরী কর। এই যে তৈরী করার বুদ্ধি, ফন্দি কি করে আসে? একটাকে বের করতে গেলেই পাঁচটা জাগে। প্রকৃতির নিয়মই তাই। প্রকৃতি কি তোমার পিছনে পিছনে খোঁচাবে 'জাগো জাগো' ব'লে? তাগাদার তাগিদে প্রয়োজনে আপনি করিয়ে নিচ্ছে। সৃষ্টির এমনই নিয়ম, সবকিছুর সমন্বয়ে প্রত্যেকে প্রত্যেকের সহযোগিতায় জানার পথে জানতে জানতে অগ্রসর হচ্ছে উন্নতির পথে। তবে যারা চলে গেছে, তারা ছেড়ে গেছে। কে কি মনে চলে গেছে, তাদের সঙ্গে দেখা হলে আলাদা কথা। আমার কথা হ'ল, 'তুমি স্ত্রী-পুত্র ত্যাগ কর', আমাদের এসবের কোন বালাই নেই। 'মায়া মোহ থাকলে হবে না', এত সমস্ত কথার প্রয়োজন আছে কি না। আমরা তো এমনি ছাড়া। যেখানে চক্ষু বুঁজতে হবে, প্রকৃতির নিয়মেই চক্ষু বুঁজে যায়, সেখানে আমার প্রয়োজনের, উন্নতির পথে এরা কতখানি সাহায্যকারী দেখতে হবে। আর ছাড়াছাড়ির কোন প্রশ্নই নাই, শুধু মাত্রা ছাড়িয়ে যেন না যায়। যে যেইভাবে আছ, শুধু সমতা রেখে একটু কাজ কর।

একজন গেরুয়া পরা বলে, আমার কোনদিকে মন যায় না। আমি জপ নিয়ে আছি। আমার কোন ক্রোধ নাই। আমি সব ছেড়েছি।

তখন অন্যান্যরা বলছে, 'ইনি তো সব ছেড়েছেন।'

আমি জিজ্ঞাসা করি, তোমার হজম হয়?

উত্তর ঃ আজ্ঞে না, আমার হজমশক্তি নাই।

আমি— হজম না হলে আর খাবে কি? খেতেই যখন পারবে না, এটা কি ছাড়া হল? জ্বরেতে মুখে ভাল না লাগলে কি ছাড়া হল? সিদ্ধি মুক্তিপথের লোকের কথায় সবটাই ভাল লাগার কথা। তোমার সবটা ভাল লাগে না। কাজেই এটা সিদ্ধি মুক্তির কথা তো নয়। তোমার এটা ব্যাধির কথা। ওর কথা হল, কলেজে যখন পড়ে, তখন একটা ঘা খেয়েছে। এখন যাকে দেখে, তারই উপর চটে।

আমি বললাম, এটা ভাল নয়। এটা তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। ছাড়াছাড়ির ব্যাপার নয়। আছে ষোল আনা। ভাব দেখাচ্ছে, যেন সব ছেড়েছে।

আর এক বাবাজী বলছে, আমি তো কোন জীবহত্যার মধ্যে নেই। আমি নিরামিষ খাই। জীবহত্যা পাপ।

আমি— নিরামিষ খেলে যদি ভগবান পাওয়া যায়, তবে তো নিরামিষ খেয়ে সবাই ভগবান পেত।

প্রশ্ন ঃ জীবহত্যা করলে কি পাপ হয়?

উত্তর ঃ নিজেরা তৈরী করে বল, এটা পাপ, এটা পুণ্য। কোন্‌টা পাপ, কোন্‌টা পুণ্য, এটা তো তোমাদের তৈরী। তোমাদের দেহ, ইন্দ্রিয় যা চায়, তাই কর। যা চায় না, তা করবে না। দেখবে, সবসময় যেমন চাইছে, ভিতর হতে সূক্ষ্মে একটা আছে, প্রদীপের মত গাইড করছে, চালিয়ে নিচ্ছে। বলছে, 'এটা কর,' 'ওটা কোর না।' আমাদের জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদিগকে সজাগ করে দিচ্ছে। আলাদা নির্দেশের প্রয়োজন হয় না। এটাকে বুঝলেই হয়ে যায়। ভিতর হতে সদাসর্বদা

সজাগ করে দিচ্ছে, 'এটা করা অন্যায়'। তা সত্ত্বেও অন্যায় করে চলেছে। ধরা পড়লে বলে, 'বুঝতে পারি নাই।' তা আলাদা কথা।

বিশ্বপ্রকৃতির নিয়মানুযায়ী জীবনের চলার পথে স্রষ্টা আমাদের ভিতর সজাগের যন্ত্র এমনভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন, যা সবসময় সজাগ করে দিচ্ছে। আমরা অনেক কিছু করি। বাইরের ফোর্স বা পরিবারের চাপে অনেক কিছু করতে হয়। কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তে সজাগওয়ালা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। ঐটার নির্দেশে মর্মে মর্মে চললে তোমাদের সিদ্ধি মুক্তি হবেই। ঐটার সঙ্গে মিললেই সিদ্ধিমুক্তি হবে। কিন্তু ঐ মিলতি আর হয় না। কিছু করার পর যদি কোন 'কিন্তু' না আসে, তবেই হল। 'কিন্তু' যখন থাকবে না, দ্বিধাবোধ আসবে না। ঐটার (বিবেকের) সঙ্গে দ্বন্দ্বে আছে বলেই জ্বালা যন্ত্রণায় থাকবে। সংসারে যে যা কিছু করে, বুঝেই করে। যে ধুয়া খায়, যে চা খায়, ভাবছে ভাল নয়, তবু খাচ্ছে। সে জানে এটা ভাল নয়। ধুলা আসবার আগেই চক্ষু বুঁজে ফেলে। খাবারে চুল দেখলেই থুঃ করে জিহ্বা আগেই ফেলে দেয়। প্রতিটি ইন্দ্রিয়ই আগে থাকতেই সতর্ক হয়ে রয়েছে। সব চোখ অন্ধ হয়ে যেত, যদি না সজাগ থাকতো। কোন খারাপ জিনিস ভিতরে ঢুকবার আগেই সতর্কের জিনিস সজাগ। পাপ কোন্‌টা? শাস্ত্রে কাকে পাপ বলে?

সেটাই হবে পাপ, যেটা মনের সঙ্গে, সতর্কতার সঙ্গে যুক্ত না হয়। সজাগওয়ালার হাতে যদি হাত না মিলাও, সেটাই পাপ। অদৃষ্ট, কর্মফল পাপ নয়। সৃষ্টির নিয়মে স্রষ্টা জীবজগতের সকলে যাতে তাঁর কাছে পৌঁছতে পারে, তার জন্য এমনভাবে সাজিয়ে দিয়েছেন তার পথ ঘাট। এই বেদ, এই চতুর্বেদ আমাদের এই দেহ। তাতে আছে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা ও সহস্রার— এই সপ্তচক্র। এই বেদে, এই দেহে প্রতিষ্ঠিত আছে সব। তুমি লোভের বশবর্ত্তী হয়ে বা যেকোন কারণে যা খুশী করতে পার। কিন্তু স্রষ্টা জানিয়ে দেবে, 'সতর্কতার যন্ত্রে'। মরবার আগে পর্যন্ত সে সতর্ক করে দিচ্ছে। দেখবে, বাপকে যদি সেবা কর, মাকে যদি সেবা কর, বেশ

ভাল লাগবে। বাবা বলছেন, 'কত খাওয়ালি, আনন্দ হল।' ট্রেন ছাড়ছে, বাবার চোখে জল, তোমার চোখেও জল। বাবা কত খুশী হয়েছেন। এই যে তৃপ্তি, পিতার যে স্নেহ, ঐ সতর্কেরই সাথে একসাথে রয়েছে।

আর বাবা কাছে আসলে যদি বলে, 'আপনি খাবেন, খাবেন। আমি জানি কি? কেবল এটা খাব, ওটা খাব। এত লোভ কেন?' বাবা রেগে চলে গেল। গাড়ী ছেড়ে দিল। তখন শুয়ে শুয়ে ভাবছে, চোখের জল পড়ছে, 'বাবাকে কষ্ট দিলাম।' সতর্কের যন্ত্র বলছে, 'ছিঃ ছিঃ, কি করেছিস্'। বাবাকে গালি দিয়ে যদি খুশী হত, তবে আমার বলার কিছু ছিল না। খুন করে যদি খুশী হয়, তবে তার মুক্তি হবারই কথা।

এই যে পাঁঠা কাটছে। টাকার মোহে কসাই কাটছে। এত কেটেও মনে করছো, তার মধ্যে 'কিন্তু' নাই। কিন্তু প্রতিমুহূর্ত্তে অন্তরে দাগ কেটে দিচ্ছে, 'কাজটা ভাল হচ্ছে না।' এই যে সিংহ খায়, সেও ভাবে, যাকে মারছি, তার কত ব্যথা লাগে। যে জিনিস গলতি, সেটাই গোপনে করতে হয়। যেখানে স্বচ্ছভাব, সেখানে নগ্ন। সচ্ছন্দভাবের বাইরেই গলতি। যেটাতে গলদ, তা গোপনে, সেটা পালিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। কাজ যেখানে ভাল হবে, সেটা ফুটবে। দেখবে কি সুন্দর স্বচ্ছ হয়ে ফুটে উঠেছে। বুদ্ধি, জ্ঞান, বিচার ফুটে ওঠে। আমাদের ফুটতে ফুটতে মুক্তির দ্বার ফুটবে। ঘরের মধ্যে গাছকে রেখে যদি সেবা কর, সেটা নেতিয়ে পড়বে। সহজ পথ হতে বিচ্যুত হল বলেই গাছ নেতিয়ে পড়লো। ওর সহজগতি যেটা, তাতে ওকে নর্দমার পাড়ে রাখলেও হবে। আমাদের চলার পথে মুক্ত আবহাওয়া, মুক্ত পরিবেশ প্রয়োজন। পরিবেশকে সেইভাবে গড়িয়ে নিতে হবে। আমাদের নিজেকে মানিয়ে নিয়ে চলতে হবে।

নবদ্বীপ, আমার এক শিষ্য বলছে, 'আমি মিথ্যা কথা বলবো না'। আমি বলি, 'যদি পারিস, তবে ভাল।' আমি কখনও সোজাসুজি বলি না, 'এটা করিস্ না।' নবদ্বীপের যখন যেটা মনে আসে, বলে

ফেলে। এভাবে সব কথা বলে ফেলাতে ওর মনটা খুব হাল্‌কা হয়ে যাচ্ছে। বলতে বলতে এমন একটা অবস্থা এসে যায়, কিছুদিন হতে দেখে, এভাবটা সবার মধ্যেই আছে। সত্যের মধ্যে অনেক কথা আছে। একদিনে এক মুহূর্ত্তে ফুটতে পারে। একটা নিমেষে ফুটতে পারে। দর্শনের পথ খুলে যেতে একটা নিমেষ লাগে। এক সেকেন্ডে গ্রহ নক্ষত্র ঘুরে যাচ্ছে। এক সেকেন্ডে জগৎ ঘুরে আসা যায়। তার চেয়েও কম সময় লাগে ফুটতে। যদি ওটা ঠিক থাকে, এক নিমেষেই হয়ে যাবে। কিন্তু ঐ মিলতি যে হচ্ছে না। আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে ফাঁকি দেবার। কাজেই ফাঁকি ফুঁকি দিতে দিতে ঐ সতর্কের যন্ত্রটা বিকল হয়ে যাচ্ছে। মিলতিতে আনাটা অভ্যাসে আনতে হবে। কি করে এটা সফল হয়? স্বপ্নের মাধ্যমে সম্ভব হতে পারে। স্বপ্নের সময় ঐ যন্ত্রটা ঠিক থাকে। জাগরণে যা হয়, স্বপ্নে তা থাকে না। এম.এ. পাশ। স্বপ্নে অ আ ক খ পড়ছে। শ্লেট পেনসিল নিয়ে দৌড়াচ্ছে। স্বপ্নে যেরকম সহজে কাজ হয়, জাগরণে সেটা হয় না। কাজেই ঘুমে জপ করবে। ঘুমের শয্যা হচ্ছে শব শয্যার মতো। জপ করতে করতে ঘুমাবে। ঘুম যেন তোমার হয়ে জপ করে, তুমি ঘুমকে বলবে। ঘুম করে কি, ঘ্যাচ্ ঘ্যাচ্ করে ৫/৬ ঘণ্টা চালায়। এই ঘুমন্ত এবং জাগ্রত অবস্থাকে এক মাত্রায় আনতে হবে।

জাগ্রত অবস্থায় যা করতে ৫০ বছর লাগে, স্বপ্নে তা এক সেকেন্ডে হয়ে যায়। অতি দ্রুতগতিতে সাহায্য হওয়ার জন্যই এই স্বপ্ন। স্বপ্নের অবস্থাটা মাথা খারাপের অবস্থা নয়। স্বপ্নে ঘটনার সামঞ্জস্য থাকুক বা না থাকুক, তাতে কিছু আসে যায় না। স্বপ্নে জাগ্রত অবস্থাটা ভুলিয়ে রেখে জাগ্রত অবস্থার মত সজাগ অবস্থায়, ওটা চালিয়ে নিতে পারে। স্বপ্নে মনে কর, ওকে কাটলে, তাকে কাটলে কোন মানে নেই। তুমি গোবর দিয়েই ভর আর ময়লা দিয়েই ভর, ওজনটা দেখবে। গাড়ি বা বগি কি দিয়ে ভরলে, পরবর্ত্তী কথা। তোমার স্বপ্নের বস্তু যা কিছু আসুক, তুমি দেখবে, তোমার মনকে জাগ্রত অবস্থাটা ভুলিয়ে রাখতে পারে কি না। স্বপ্নে ভীতিতে মানুষ মারা গেছে। স্বপ্নে পেট ফাঁপিয়ে দেয়, বোবা ধরিয়ে দেয়, বীর্যপাত করিয়ে দেয়, প্রস্রাব করে

ফেলে। এটা কোন্ ক্রিয়াযোগ? ঘুমের মধ্যে সমাধি যোগ আছে বলেই এটা সম্ভব হয়। ঘোলাটে জল স্বপ্নের মাধ্যমে filtered হয়ে শুদ্ধ জলে আসলো। সেই শুদ্ধ জলকে নর্দমায়ই ঢালো বা স্নান কর, সেটা তোমার ব্যাপার। ওই যে যোগ, স্বপ্নযোগ, এই স্বপ্ন-যোগবিধির এত সুন্দর ব্যবস্থা, চিন্তা করা যায় না। এমন সুন্দর আশ্রম, ৬০/৬৫ বছরের ঘর যেটা, সেই স্বপ্নের আশ্রম অতি সুন্দর। স্বপ্নের মাধ্যমে লক্ষ বছরের জিনিস অতি সহজে পাওয়া যায়। তুমি যদি স্মরণ কর, যে বাপ মরে গেছে, স্বপ্নে দেখছ, সেই বাবার সঙ্গে কথা বললে। কাজেই আসুক বা না আসুক পিতৃদর্শন হলো, কারও বা মাতৃদর্শন হলো। স্বপ্নে যখন সৃষ্টি করলো, ঐ সৃষ্টিতেই প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। তখন তুমি স্বপ্নকে গাইড করতে পারবে, চালনা করতে পারবে।

আমি একজনকে বলেছি, 'স্বপ্নে তোকে মন্ত্র দেব।' মন্ত্র দিলাম। তারপর বলে, 'আমি বিয়া করবো।' স্বপ্নে বিয়ে দিয়েছি। স্বপ্নে ছেলে হয়েছে। জাগলে জিজ্ঞাসা করেছি, 'বউ বাচ্চা ভাল আছে?'

— আজ্ঞে হ্যাঁ। বাচ্চার সর্দি হয়েছে, রাসটক্স (Rustox) দিচ্ছি। তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে। স্বপ্নে বাড়ীঘর তৈরী করছে। সেখানে আবার ঘুমিয়েছে। এক নম্বর বাড়ীতে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে। দুনম্বর ঘুমে আমার জন্য একটা বাড়ী করেছে। স্বপ্নে আমায় দেখছে। 'ও' অন্নপূর্ণা পূজা করবে। 'ও' হাতজোড় করে রোজই ওঠে। এখন আমার কাছে এসে বলে, 'ঠাকুর, ঐ কথাটা।'

আমি বলি, 'আচ্ছা, অন্নপূর্ণা ঐভাবে ঘরের ঐ কোণে বসাও। ' স্বপ্নে তো টাকা পয়সা লাগে না। কাজেই বলি, 'ইচ্ছামতন সবাইকে প্রাণভরে দুনিয়া শুদ্ধ খাওয়া। সবাইকে দক্ষিণা দিবি।'

'ও' ঢোল পিটাইয়া গ্রামকে গ্রাম নিমন্ত্রণ করেছে স্বপ্নে। গলবস্ত্র হয়ে সবাইকে বলছে, 'সবাই ভাল করে খাবেন।' দক্ষিণা দিচ্ছে। খুব ভাল করে খাইয়েছে। ঘুম থেকে উঠে বলে, 'ঠাকুর কি আনন্দ। প্রভু,

অমৃতি, রসগোল্লা, লালমোহন, আরও কতরকম মিষ্টি, সব খাইয়ে দিয়েছি।'

আমি জিজ্ঞাসা করি, কত খরচ হয়েছে?

— আজ্ঞে, এখনও হিসাব করি নাই।

তারপর বলি, আচ্ছা, এখন সাধুসেবা কর।

'ও' তড়িঘড়ি ঘুমিয়েছে। গেছে পাহাড়ে। হাজার হাজার বছর বসে আছে। সেইসব বিরাট বিরাট সাধুদের, ঋষিদের নিমন্ত্রণ করেছে। তারা সবাই খেয়ে খুব খুশী হয়ে আশীর্বাদ করেছে।

এবার বলেছি, 'শিবলোকে যাও এখন, তাদের সেবা কর।'

'ও' তাড়াতাড়ি শিবলোকে গেছে। তারা বলে, 'আমরা মর্ত্ত্যলোকে যাব না। তুমি এখানে এসে খাবার ব্যবস্থা কর।' ঐ করতে করতে শূন্যে উঠে গেছে। তাড়াতাড়িতে লাফ দিয়ে দিয়ে চলতো তো। মানে ঐ দুটো চলা এক হয়ে গেছে।

প্রত্যেকটি জীব এক একটি গ্রহ। ঐ আকর্ষণ আর এখানকার আকর্ষণ যদি এক হয়ে যায়, তা হলে এখানকার আকর্ষণ হালকা হয়ে যায়। যে কোন মুহূর্ত্তে তুমি শূন্যে উঠতে পারবে। শূন্যে বিচরণ করতে পারবে। তারপর ওকে টানতে টানতে এখানে টেনে এনেছি। এখন দিনরাত অদ্ভুতভাবে দর্শন হয়ে যাচ্ছে। এই যে আমি এখানে। 'ও' উপলব্ধি করছে। সে সব বুঝতে পারছে, শুনতে পারছে, দেখতে পাচ্ছে, আমি কি করি। শয্যার আসনে, ঘুমের আসনে সমাধি এমনভাবে সাজানো।

দেখ, এত অল্প আয়ু। চিন্তা কর, আমরা এমন কোন আকামটা নেই, যা না করি। কি না করি আমরা। সজাগের যন্ত্র ধাক্কাতো দিয়েই চলেছে। দ্বন্দ্ব, সন্দেহ, অবিশ্বাস সংসারে চলছেই। আমি যে ভগবান,

আমাকেই সন্দেহ করে। আমি তো বুঝি। আমি বলছি, 'কি রে, আমায় সন্দেহ করছিস?' বাপকে সেবা করছে। বাপকে সন্দেহ করছে।

তখন কানমলা খেয়ে বলে, 'আর করবো না।' আবরণ থাকতে পারে, কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তে দংশন হচ্ছে। এরজন্যই দিনরাত গুরু-সঙ্গত করো, গুরুবাক্য, গুরু নির্দেশ মেনে চলো। গুরুর আদেশ মান্য করো। এইভাবে যদি চলি, অদ্ভুত দর্শন হয়ে যায়। স্কুলে যখন পড়ি, ক'দিন স্কুলে যাইনি। যেদিন গেছি, মাষ্টার মশাই জিজ্ঞাসা করেছেন, 'আসনি কেন?'

আমি চিঠি নিয়ে গেছি, 'মা ছুঁতে পারে না, আমাকে রান্না করতে হয়েছে। তাই তিনদিন আসতে পারিনি।'

মাষ্টারমশাই চিঠি পড়ে অভিভূত হয়ে গেছেন। বললেন, 'তুমি এমন কথা লিখতে পারলে? এমন একটা ব্যক্তি। আমাদের স্কুলের গৌরব।'

আমি বলি, 'কেন পারবো না মাষ্টার মশাই? যা সত্যি, আমি তাই লিখেছি।'

আর এক ছাত্র। আমার লগে (সঙ্গে) পড়ে। স্কুলে আসেনি। চিঠি এনেছে, 'আমার ঠাকুমা ছুঁতে পারে না।'

— তোমার ঠাকুমার বয়স কত?

— আজ্ঞে, ৮৫।

তখন সে খেল বেতের বাড়ি, মিথ্যা কথা লেখার জন্য। সেই ছাত্রটি আমাকে বলে, 'ঠাকুর ভাই, তুমি তো তোমার মায়ের কথা বলেছ। আর আমি আমার ঠাকুমার কথা বলেছি। তোরে তো মারলো না।'

আমিও তো ভাবছি। এবার আমার উপর আসবে নাকি? আমি বলি, 'তুই আমার কথা কেন বললি?'

মাষ্টারমশাই আমার সেই এ্যাপ্লিকেশনটা স্কুলে রেখে দিয়েছেন। একটা মুসলমান মেয়ে আমায় ভালবাসতো। তার বাবা বিয়ের সম্বন্ধ করতে আমার বাবার কাছে গেছে। মেয়ের বাবা বলে, 'সুরেন বাবু, আপনার পোলার (ছেলের) সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়া দিন।'

বাবা আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন, 'ঐ মেয়েটাকে তুই ভালবাসিস্? বিয়া করবি?'

আমি বাবাকে বলি, 'আপনি যদি বলেন, তবে বিয়ে করতে পারি।'

বাবা পরে মেয়ের বাপের কাছে গিয়ে বলেন, 'এর কোন জ্ঞানবুদ্ধি নেই।' পরে সেই মেয়ে আমাকে এক চিঠি লিখেছে। আমি প্রত্যেককে সেই চিঠি দেখিয়েছি। আমি কেন লুকাবো? আমার গলদগুলো আমি সবাইকে বলে রাখবো। এই যে বলু, বিশু সই করিয়ে নিল। আমায় ফাঁসিয়ে দিল। আমি তাদের বিশ্বাস করেছিলাম। আমি শৌলমারী আশ্রমে গিয়েছিলাম। এই কেস সেই সাধুর ঘাড়ে ছিল। মনোরঞ্জন ভদ্র সেই কেস করেছিল। সেই সাধুকে জেলে নিয়ে যাবে। আমি গিয়ে মিটিয়ে দিলাম। ওরা তখন সব দীক্ষা নেয়। এখন সেই কেস আমার উপর। এহেন বদনাম নেই, যা আমার উপর না এসেছে। এক জায়গায় গেছি, এক মেয়ে আটকিয়ে দিয়েছে। বলে, 'বিয়ে করবো।' তখন আমার ১৭ বছর বয়স। আমার জীবনের সব গলদ ত্রুটি তোমাদের জানা উচিত। আমি খুলে বলবো। কত বাধা-বিঘ্ন কাটিয়ে আসতে হচ্ছে। বলু বাজারে কিছু ফটো দিয়ে এসেছে। আমি মন্ত্র দিচ্ছি মেয়েলোককে, সেই ফটো নিয়ে বলু, বিশু দিয়ে এসেছে।

৮০/৯০ লক্ষ লোকের মধ্যে আদিবেদ, আদিবেদের তত্ত্ব ছড়িয়ে দিচ্ছি। তার জন্য কি সত্য কথা বলবো না? আমি আমার চিন্তাধারার

দ্বারা আমার উপর যারা নির্ভরশীল, তাদের ক্ষতি করতে পারবো না। ইঞ্জিন হয়ে আমায় চলতে হবে। তোমরা থাকবে বগির মতো। সত্যিকারের সুরের সাথে যারা আটকে যাবে, তারা পিছলিয়ে যাবে না।

সোনাগাছির বেশ্যা যে মেয়েলোক দীক্ষা নিয়ে গেছিল, কোন আশ্রম তাকে দীক্ষা দিতে চায় না। সে বলে, 'আমি বেশ্যা। সোনাগাছি থাকি। আমার বাড়ী গিয়ে আমাকে দীক্ষা দিতে হবে।'

আমি রাজী হয়েছি। আমি যাব। গাড়ী নিয়ে এসেছে, ফুল টুল নিয়ে। আমি নামছি, 'ও' এসে পায়ে পড়েছে। 'আপনি যে যেতে রাজী হয়েছেন, তাতেই হয়েছে। আপনার আর যেতে হবে না। এই আপনার যাওয়া হয়েছে।' আমার সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে হলে, যত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করা প্রয়োজন, আমি তা করবো। যেখানে লালবাজারকে ধ্বংস করতে এক সেকেন্ড লাগতো না, আমি আমার শক্তিকে নিজের জন্য ব্যয় করবো না। আমার মাংস আমি নিজে খাব না। মা কখনও নিজের স্তন নিজে পান করে না। রাম নামে সাগর পার হয়ে যাচ্ছে হনুমান। কিন্তু রামচন্দ্র নিজে পারে না। শ্রীরামচন্দ্র বলে, 'আমি নিজের ক্ষমতায় নিজে আটক।' হনুমান দেখাচ্ছে, গুরুর নামের মাহাত্ম্য। রামের নামের মাহাত্ম্য হনুমান নিজে অনুভব করছে। এতবড় বিরাট ক্ষমতা যাঁর, তিনি কিন্তু নির্বাক হয়ে রয়েছেন। শ্রীরামচন্দ্র সবাইকে, ব্রাহ্মণকে হাত জোড় করছেন, 'উদ্ধার কর।' তিনি বলছেন, 'হনুমান আমায় বাচাও। ' নামের যে কত শক্তি আছে। একদিকে রাম (শ্রীরামচন্দ্র) নির্বাক, আর একদিকে রাম কত সজাগ। কতবড় ক্ষমতা। নিজে যদি দেখাতেন, তাহলে এত হতো না। তাঁর (শ্রীরামচন্দ্রের) মাহাত্ম্য প্রকাশ করলো হনুমান। তাঁর মাহাত্ম্য প্রকাশ করলো লবকুশ।

এখানকার কাজকর্মে গুরুকে দেখতে নেই। বাইরের কোন কিছু দেখে গুরুকে বিচার করবে না। দেখবে, কোন সময় তোমায় টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। তোমরা অদ্ভুতভাবে কাজ করবে। আজ রবিবার।

সামনের শুক্রবার জন্মতিথি উৎসব পালন করতে মনস্থ করেছে। আমি তো বলি, এবার নাই করলে। যাক্ সকাল বেলাটা এখানেই হবে ১১/১২টা পর্যন্ত। তারপর ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে যাব। তোমরা নিষ্ঠামতন কাজ করবে। তারপরের রবিবারটা এখানে থাকবো। ১৫ তারিখেও যেতে পারি, আবার ১৮ তারিখেও যেতে পারি। এখানে একটা ফ্ল্যাট নেবার চেষ্টা করছি; কেসটা না মেটা পর্যন্ত। সুখচরের বাড়ী ভাঙাগড়া চলছে। কালিদাস সব জোগাড় যন্ত্র করছে। সেখানে হতে পারে, তবে কতদিন লাগবে, কে জানে। উৎসবের পর এই রবিবার হতেও পারে। এই বাড়ীওয়ালা যথেষ্ট সাহায্য করছে। তাদের উপর তোমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। সে কখনও বলে না, 'ঠাকুর চলে যাও'। আমাদের কর্ত্তব্য তাকে গুছিয়ে দিয়ে চলে যাওয়া। এখানে যে বাড়ী নিয়েছি, মাঝে মাঝে যেতে পারবে না, তা নয়। ঠিকানা নিয়ে নেবে। ফাঁকে ফাঁকে প্রণাম করে আসতে পার। তবে বেশীক্ষণ থাকতে হয়তো পারবে না। পার্কষ্ট্রীট, ট্রাম থেকে নেবেই। উদ্দেশ্য ছিল না যাবার। সেটা জেনে নিও। আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

যোগসূত্রে যাঁরা যোগাযোগ করেন, যোগ বা ধ্যান করেন, তাঁরাই মহান

১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬
পাম এ্যাভিনিউ, কলকাতা

চন্দ্রনাথ পাহাড়ে গিয়েছিলাম, বুঝলে? তখন আমার বয়স ১৩/১৪ বৎসর হবে, বারোও হতে পারে। চন্দ্রনাথ পাহাড়ে যাবার আগে সীতাকুণ্ড, না কি যেন একটা জায়গা পড়ে, ওখানে সাধুদের একটা আখড়া আছে, পাহাড়ের নীচে। অনেক সাধু জমা হয়েছে, হাজার খানেকের কম নয়। বিরাট হোম টোম জ্বালিয়ে বসে আছে। সাধুদেরই জায়গা ওটা। আমার সখ হল একটু বসি। আমার সঙ্গে একটা ছেলে ছিল, স্কুলে পড়তো। আর ছিল আশু সেন। তাঁকে ডাকতাম জ্যাঠামশায়। আমি বললাম, 'আমি এখানে বসি। আপনি পাহাড়ে ঘুরে আসুন।'

আমি সাধুদের মধ্যে বসে পড়লাম। তখন সাধুর মত চেহারা ছিল। শালু টালু পরতাম। ওখানে বহুলোক দর্শন করতে যাচ্ছে। ধূপ

ধুনা জ্বলছে। দেখবার মতো হয়েছে জায়গাটা। একজন লোক এক এক জায়গায় এক আনা, দু' আনা করে দিচ্ছে। আমার দিকে কেউ আসছে না।

আমি বলি, 'ও মশাই, আমার দিকে তাকান না কেন?' তার স্ত্রী হেসে ফেলেছে। ভদ্রলোকের স্ত্রী বলছে, 'আপনি ডাকছেন? আমায় ডাকছেন?' ভদ্রলোক বলে, 'আপনি বসে আছেন?'

আমি বলি, হ্যাঁ, বসে তো আছি।

— কতক্ষণ বসে আছেন? আপনি কি এখানকারই? আমি বলি, 'সাধু দেখেছেন'?

— না, সে হিসাবে দেখি নাই।

অনেকে প্রণাম জানাচ্ছে। হাতজোড় করলাম অনেককে। আর একজন এসেছে। গলায় মালা টালা আছে। হরিবোল, হরিবোল করছে।

এক সাধু বলছে, 'আচ্ছা বাবাজি, তোমাকে একটা আসন দেই। নাহলে তো তোমার কাছে লোকজন আসবে না।'

আমি এক সাধুর হাত হতে চিমটা টান দিয়ে বসলাম।

সে আমাকে বলে, 'তুমি এটা নিয়ে কি করবে?' তখন চিমটা নয়, একটা ত্রিশূল নিয়ে পুঁতেছি। এরপর দু'একজন ক'রে লোক আসতে আরম্ভ করলো।

একজন বলে, 'আপনি কি সাধু?'

আমি বলি, 'তা জানি না।'

— আপনি এখানে কতক্ষণ বসেছেন?

আমি বলি, অনেকক্ষণ থেকে বসে আছি। লোক আর আসে না। আপনারা তো আমার কাছে আসেন নাই। ত্রিশূলের কাছে এসেছেন।

হঠাৎ বৃষ্টি নেমেছে। মঞ্চের সব নিভে টিভে গেছে। সাধুরা ছাই মাখাই বেশী। অনেকের পরনে আলখাল্লা ছিল। আমার গেরুয়া ছিল। এর মধ্যে সাধুদের মীটিং হচ্ছে। ওরা উপরে যাবে। একজন তার নাম ল্যাংটা মা। ভৈরব পুজোর সময় ওর খুব নাম আছে। তিনি গান গাইলেন,দেহ ছেড়ে গেলাম চলে, সবই পড়ে রইল... ইত্যাদি। গান শুনলাম। আর একজন বাবাজী বলছে, 'আমরা সব সংসার ত্যাগ করেছি। আমাদের কর্ত্তব্য আত্মার কল্যাণ করা।' আর একজন বললো, 'আমরা ভস্ম মেখেছি। সবসময় যেন ভস্ম মেখে থাকতে পারি।'

আমি জিজ্ঞাসা করি, 'আমিও বলতে পারবো?'

উঃ— না, তুমি ছোট ছেলে। তুমি কি বলবে?

আমি— কেন? আমিও তো গেরুয়া পরেছি।

ল্যাংটা মা বলে, 'আচ্ছা, তুমিও বল।'

আমি— **আপনারা আত্মার কল্যাণ, জগতের কল্যাণের কথা বলছেন, সব শুনলাম। কিন্তু কেহ কি আত্মার কল্যাণ করেছে? যা দেখলাম, সব ভুঁড়ির কল্যাণ করছে। এখানে একটিও সাধু নেই। শুধু যে পবিত্র মন নিয়ে থাকা দরকার, সেই পবিত্র মন এখানে কারও নেই।** নাটকের মন, মঞ্চে অভিনয়ের মন নিয়েই সবাই বলছে। আমিও সেই মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলছি। আমিও সেজে এসেছি। যদি কেউ সত্যিকারের সাধু হয়ে থাকেন, তবে দাঁড়িয়ে বলুন। বলি, 'কেউ তো

দাঁড়াচ্ছেন না।' ল্যাংটা মা বলছে, 'সাধু যে, সেতো দাঁড়াবেই।' তারপর বলে, 'দাঁড়ায় না। কারণ অহঙ্কার এসে যাবে।'

আমি— যা সত্য তা সূর্যের মত প্রকাশ হবে।

ল্যাংটা মা— তুমি কতদিন এ লাইনে আছো?

আমি— জন্ম যেদিন হতে হয়েছে, সেদিন হতেই আছি। এই বলে আমি বসে পড়েছি।

এরমধ্যেই কয়েকজন ভদ্রলোক বলছেন, 'আপনি আর একটু বলুন।' আবার একজন সাধু বলছে, 'আমরা সাধু নই, একথা কি করে বললেন? আমরা জগতের কল্যাণে নিজেদের বিলিয়ে দিয়েছি। আমাদের খুব মনে লেগেছে এরকম বলাতে।'

তারপর আমি দাঁড়িয়ে গেছি। যেখানে দাগ কাটে সেখানে কি সাধু হয়? এ যে দাগও কেটেছে, মনেও লেগেছে। আমি তো লাগালাগির মধ্যে নেই। আমি চেয়েছি স্বচ্ছ মন, সুন্দর মন। এত সাধু এসেছে, একজনেরও স্ফূরণ হয় নাই।

একজন ভদ্রলোক বলছে, তুমি কোন্ চিন্তা হতে বললে, সাধু নেই?

আমি— চার ঘণ্টা যাবৎ বসে আছি। **সবাই চায় আমার কাছে লোক আসুক, বসুক। আমাকে দেখুক, এদের কি সাধু বলবেন? এটা কি সাধুবৃত্তি বলবেন? তুমি যদি সত্যিকারের সুন্দর হয়ে থাকো, কে এল বা গেল, কে কি দিল বা না দিল, কিছুই এসে যায় না। সঙ্গে বা দলে যারা আছে, সব একই অবস্থা। এক এক রকম অবস্থায় এক একরকম পোশাক পরার ব্যবস্থা। কেহ স্যুট পরে, কেহ নেংটি পরে। বাবাজীরা যে উদ্দেশ্যে এই পোষাক পরে, তাতে কি তারা আছে?**

যেই পোষাকগুলো বাবাজীরা পরেছে, সেই উদ্দেশ্যের সাথে যুক্ত নেই। দেবতাকে আকৃষ্ট করার যে পোষাক, সেই বেশ সেই পরিধানের যে বস্ত্র, দেবভাবে যে গদগদ থাকবে, সেই বেশে কাহাকেও দেখি না এখানে। যা দেখছি, তা বাইরের আকর্ষণের বেশ। আকর্ষণ করবার জন্য দোকানের কাপড় জামা যেমন সাজানো থাকে, ঠিক তেমনি। সাধু বা মহান ব্যক্তিদের যে চিন্তাধারা হওয়া দরকার, তা পাইনি বলেই বললাম। কেন তারা ঐরকম নেংটি পরেছে, বলুক। দেবতার দান আমরা যতটুকু ব্যবহার করছি, তারচেয়ে বেশী কিছু তাঁর নিকট হতে পেতে পারি; তারজন্য যে ভাবাবিষ্ট হওয়া দরকার, সে ভাব পাইনি। **আমরা এখন এমন একটি বেশ ধারণ করেছি, যেন আমাদের মায়া, মোহ, লোভ কিছু নেই। এতবড় জগৎ প্রকৃতি, সেও সেজেগুজে বসে আছে। দেবতাও সেজে গুজে বসে আছে। সাজানোর মধ্যে থাকলে কি দেবত্ব নষ্ট হয়? কিন্তু এখানে এই সাজানোর মধ্যে দেখছি গলদ রয়েছে।** সেই সুর নেই।

একজন বাবাজী বলছে, আমার মধ্যে তো সেরকম ভাব আসেনি। সাধনার জন্য আমি নেমেছি।

আমি তাকে ডাকলাম, 'আচ্ছা, তুমি এস এখানে'। সে এল। বাঘের ছাল পরা, দেখতে বেশ। একটা কাঠের প্যাঁচ আছে। কি কষ্টে জড়ায়ে রেখেছে। আমি কইলাম, বাবাজী, তুমি সেই অবস্থায় আছ। এইভাবে দেবতাকে যদি এত কষ্টে আনতে হয়, তবে দেবতাকে কেহ পাবে না। দেখ, তোমার এই সাজ সাজতে কত ঘণ্টা লেগেছে। একটা খোঁপা বাঁধতে কত সময় লাগে কাঁটা কুটা দিয়ে। তোমার এই সাজ করতে কতক্ষণ লাগে?

সে বলে, হ্যাঁ, দু'-তিন ঘণ্টা লাগে।

আমি— এই সাজটাতে কি হয়? এই কাঠের প্যাঁচ দিয়া দেবতাকে কি দেখাবে? এত অলঙ্কার সব রুদ্রাক্ষের, তাই না? দেবতা

কি রুদ্রাক্ষের মালায় খুশী হবে? আদিম যুগ তো আর নেই। এই বাঘের ছাল যে তুমি পরেছ, এতে কি দেবতারা তাড়াতাড়ি আসবে? বাঘ, সিংহের কাছে কি দেবতা তাড়াতাড়ি যাবে?

সাধু বলছে, এটা একটা মনের তৃপ্তি।

আমি— মনের তৃপ্তি বললে, না? দেখ, মনের তৃপ্তির এক এক ভাব। **শ্মশানে গেলে বৈরাগ্য ভাল লাগে। শেষ বেলায় ডোমেরা শ্মশানের সেই আগুনে ভাতের হাঁড়ি চড়ায়। সব বৈরাগ্য শেষ হয়ে ভাবতে থাকে, ভাল খাট যদি আসে।** হে ভগবান,তুমি সুপ্রসন্ন, আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম, এত ভাল খাট এসেছে। আর আড়াই টাকার খাটিয়া এলে দুঃখ। বৈরাগ্য দুদিনের কথা। ভাল ভাল বিছানা, ভাল ভাল খাট এল। সাথে সাথে দোকানে চলে গেল। সেগুলোই আমরা আবার প্রয়োজনমতো কিনে নিয়ে আসি। বাবাজী, তুমি এই যে বেশ ধারণ করেছো, তোমার সব ভাব শেষ হয়ে অভাবের ভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। পৈতা হলে মাথা মুড়িয়ে দিলে প্রথম প্রথম ভাল লাগে। কিন্তু প্রত্যেক দিনই যদি সকলের মাথা মুড়িয়ে দেয়, ভাল লাগবে? এই ভাল লাগা শেষবেলায় আর থাকে না। কাজেই তোমাদের অবস্থা অন্যরকম হওয়াতে দেবতার সঙ্গে যোগাযোগ নেই। তোমরা এই সাজে সেজে রয়েছ। এসব করে মানুষকে বিভ্রান্ত করছো। অনেক লোক জমে গেছে। একজন বলছে, তবে আমরা সাধু কিভাবে চিনবো?

আমি— যার হতে তুমি নাম শুনবে, তুমি নামটুকু শুধু লও। গাধা চিনি বয়ে নিয়ে আসে। তোমার চিনিই দরকার। যে যে সাধুরা নাম করে যাচ্ছেন, সেই নাম নেবে। সে কি, কি সাজে সেজেছে, তা দেখবার দরকার নেই। বাজারে তোমার সঙ্গে শুধু জিনিসের সম্পর্ক। তুমি তরকারি কিনে নিয়ে গেলে। টাকা দিয়ে তো আলুওয়ালা বা দোকানীকে কেন নাই। কাজেই এই যে সাধুরা সাধু বেশ ধারণ করে আছে, নাম বিলাচ্ছে, তাই নিয়ে যাও। এতে সাধুরা একটু বল পেল।

সাধুরা— তাহলে খারাপ স্তরে থেকেও আমরা কাজ করছি।

আমি— আমি দেখবো, তোমরা সেই যোগাযোগের সুরে যুক্ত আছ কি না। আলাপ প্রসঙ্গে তত্ত্বের স্ফূরণ হলেই বোঝা যায় সাধুকে। আমি ল্যাংটা মাকে বললাম, 'তোমরা কিছু বল।'

ল্যাংটা মা— আমি কিছু জানি না। এসব কিছু বুঝি না। দিনরাত মা মা করি, যদি তিনি খুশী হন, আসবেন। যতটা পারি চেষ্টা করি। সব ভাব তাঁর (মা'র) আছে। থাকবে না কেন?

আমি— স্বীকারোক্তি যদি করে, তবে 'আমি ভেক ধরে আছি,' তার মধ্যেও সৌন্দর্য আছে। **যেকোন ব্যক্তির মধ্যে সাধুত্ব থাকে, সৎবুদ্ধি থাকে। সৎবুদ্ধি নিয়েই জীবের জন্ম হয়। যারা জপ তপ বেশী করে অল্পতেই একটু এগিয়ে যায়। আর যারা না করে তাদের মধ্যে জাপ্য অবস্থায় থাকে। যে নিয়মের ধারায় এই অপূর্ব সৃষ্টি চলেছে, সেই যোগসূত্রে যাঁরা যোগাযোগ করেন, যোগ বা ধ্যান করেন, তাঁরাই মহান। এই বিশ্বপ্রকৃতির উদ্দেশ্যের সহিত যাঁরা এক উদ্দেশ্যে চলছেন, তাঁরাই মহান।** প্রকৃতির নিয়মের সঙ্গে, জগতের নিয়মের সঙ্গে যারা যুক্ত, তারা গুণ্ডামী করে কি লোচ্চামি করে, দেখতে যাব না। জলের ওপর দিয়ে ময়লা যায় অনেক। সাগরের সঙ্গে যুক্ত আছে বলেই কোন অনিষ্ট করতে পারে না। তুমি কোন্ যোগাযোগে যুক্ত হয়ে থাকবে? কোন আসন কর বা না কর, যোগাযোগ চলছে। এই অনন্ত বিশ্বের চিন্তাধারার সহিত তোমার চিন্তা যদি এক ধারাতে থাকে, তবেই সেই শ্রেষ্ঠের শ্রেষ্ঠ আসনের সঙ্গে তোমার আসনের যোগাযোগ থাকবে। চরম ত্যাগী তারাই হতে পারে, সেই আসনে বসে যারা যোগাভ্যাস করে। সেই হবে যোগী, সেই আসনে যে উপবেশন করবে। অনেকে অন্য পথ অবলম্বন করে বলে, 'এখানকার যে ধারা, সেটা বেসুরো।' এই ধারার সঙ্গে, এই যোগের সঙ্গে যোগাযোগ নেই বলেই মানুষ বিভ্রান্ত হচ্ছে এবং তা সঠিক বলে বুঝাবার জন্য ভেক ধারণ করছে। সত্যরূপ নেই বলেই ছল, চাতুরী কৌশল অবলম্বন

করছে। যেমন একজন বলছে, জমিদার সে নয়। তাকে জমিদার সাজতে হয়। জমিদার এসেছে, পোশাক হাওলাত করে। যেসব জায়গায় তাকে জমিদার সাজতে হয়, ধার করে করে সব করে। একে তার অভাব, সে ফাঁকি দিতে শুরু করলো। শেষ বেলায় চুরি করতে আরম্ভ করলো।

আর তুমি যদি এই বিশ্বের ধারার সহিত তোমার যোগাযোগ রাখ, তখন অদ্ভুত এক সুরের সাড়া তুমি পাবে। 'প্রকৃতির নিয়মের সহিত এক নিয়মে থাকবো,' এই চিন্তায় থাকবে। বর্ষার সাথে সাথে চারিদিকে সব সতেজ হয়ে ওঠে। বর্ষার আগমনের সাথে সাথে যত গাছ গাছড়া কি সুন্দর সবুজ প্রাণের স্পর্শে জেগে ওঠে। 'আমার মনে এখন বর্ষা আসুক', এই রকম ফুটে ওঠার ভাবে ভাবাবিষ্ট হয়ে, আমার ভিতরকার সুপ্ত জিনিস যদি ফুটতে থাকে, আমার ভিতর যদি স্পর্শের বর্ষা আসে, নিশ্চয়ই ফুটে উঠবে। কারণ চিন্তার সাথে সাথে ফুটে উঠবে। বর্ণনায় ফল হয়, চিন্তায় ফল হয়। এইজন্যই স্রষ্টা তাঁর চিন্তা দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তোমার মধ্যে স্রষ্টার সেই মন, সেই চিন্তা রয়েছে। কাজেই তোমার মনের বর্ণনায় নিশ্চয়ই ফল হবে। মেঘের তেজ, বর্ষার তেজ, সেতো সূর্যেরই তেজ। **সূর্যের তেজের ন্যায় যদি আমার মনের তেজ জাগ্রত হয়, তবে কার তেজ বেশী? সূর্যের যে তাপ আছে, অনন্ত কোটি গ্রহ নক্ষত্রের তেজ ধারণ করার ক্ষমতা মনের আছে।** আর কিছু নয়। সূর্যের তাপের কথা আমি বর্ণনা করলাম, আমি মনকে শুধু এই কথা জানালাম। এই যে মশা, মাছি গন্ধে চলে আসে, মনের শক্তিতেই আসে, খাবারের উপর বসে। মনের মধ্যে ঠিক ঠিক চিন্তা যখন আছে, আমি বর্ণনা করে যদি মনকে জানায়ে দিই, যেমন এই মন হতে এই অপূর্ব সৃষ্টি হয়েছে, সেই মনের কাছে যদি আবেদন নিবেদন করি, নিশ্চয়ই চিন্তা ফলপ্রসূ হবে। সূর্য, বাতাস, মাটি যেমন রক্ষা করছে, আমি যেমন এগুলো হতে সৃষ্টি হয়েছি, এইভাবে যদি মনে মনে চিন্তা করি, সব নদী, খাল যেমন সাগরের সাথে যুক্ত, মনও তেমনি ভগবৎ প্রেমের সঙ্গে যুক্ত। মন এক মনের সঙ্গে যুক্ত। সকল জীবের মনের সঙ্গে বিরাট স্রষ্টার মন যুক্ত আছে। কাজেই আমি যদি

তার কাছে আবেদন করি, 'আমি যা কিছু করি, হে মন তুমি আমাকে সেইভাবে গড়ায়ে নাও।' এই যে ভালবাসা, প্রেম, সৃষ্টি সবই তো মন থেকেই হয়।

মনই বুদ্ধি যোগায়। চিন্তা করেই সব হয়। জ্ঞান তার সঙ্গে যুক্ত হয়। মনের কাছে গিয়ে ধাক্কা দেয়। মন স্বচ্ছ জিনিস বুদ্ধি এবং বৃত্তির কাছে গিয়ে নিবেদন করে। এই যে উত্তেজনা হয়, মনের থেকেই সৃষ্টি হয়। মন হতেই রক্ত, বীর্য, মাংস হতে থাকে। মনের ধারা সমস্ত ধারার মধ্যে পড়তে থাকে। তোমার বুদ্ধি এবং চিন্তা মনের মাঝে সংগ্রহ করবে। তুমি ভাববে, 'আমি কিভাবে সুন্দর হবো।' **মনকে প্রাণ বলে, মনকে আত্মা বলে, মনকে জ্ঞান বলে, মনকে বুদ্ধি বলে। কারণ এই সূত্র ধরেই সবাই সমসুরে বাঁধা আছে।** কাজেই যে যার কাছে যা কিছু আবেদন করুক, সবই একটা সুরে বইতে থাকে। সুপারী গাছ, তাল গাছ, নারকেল গাছ কত লম্বা। তাদের টানে নীচের জলটা ওপরে ওঠে। মনের টানে উপরের দিকে উঠে আবার নীচের দিকে নামে। এই আকর্ষণের ফলে, মনের সুন্দর টানাটানির ফলেই সমস্ত জগৎ আছে। এই **আকর্ষণ আছে বলেই প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের যোগাযোগ রয়েছে। ফাঁকার মধ্যে মনের যে খেলা, সেই ফাঁকার কাছেই আমরা আবেদন করছি। বিক্ষিপ্ত চিত্তে অস্থির চিত্তে সব কিছু বলছি। এই যে সব সময় মনে মনে বলে যাই, এই বলে যাওয়াটাই মন্ত্র। মন থেকেই মন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছে। যখনই কিছু বলবে, মন্ত্র আরম্ভ হল। মন্ত্রের সাধনায়, মন্ত্রের মন্ত্রণায় যদি দেবতা আসেন, এই মন্ত্র সাধনাতেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে।** যে সাধনায় জগৎ সৃষ্টি হয়েছে, তোমার চিন্তায় সংসার মঞ্চে তুমি অন্যরকম হয়ে যাবে। আর আরেকটা মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলবে, 'এস কাজ কর। আমার এসবের কি দরকার আছে?'

কতদিন আছি আর। আমার বাবা চলে গেছেন। আমিও চলে যাব। মনের টানে আসে। আবার এই মন বিলীন হয়ে আর একটা

মন হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। কাজেই মনের কাছে যদি সবসময় আবেদন করি, নিবেদন করি, তবেই কাজ হয়। তুমি তোমার মধ্যে সবসময় জানাবে, 'হে মন, তোমার অনন্ত সুরে আমাকে টেনে নাও। অনেক সময় রাগ, দুঃখ, শয়তানী বুদ্ধি হয়, তুমি আমাকে সুন্দর করে গড়ে নাও।' এইরকম সিলিফুঁড়ি (সেলাই ফোঁড়াই) দিতে দিতে সুন্দর হয়ে যাবে। আমাদের দেশ হ'তে রাণীকে কাঁথা দিয়েছিল। তার দাম অনেক বেশী। সেইরূপ যে যত সূক্ষ্ম সিলিফুঁড়ি দিতে পারবে, পাতা, ফুল করবে, সে তত সুন্দর হবে। তুমি তোমার মধ্যে বর্ণনা কর, চিন্তা কর, দেখবে শুদ্ধ মন, শুদ্ধ চিন্তা আসবে। প্রতি মুহূর্ত্তে অতি সহজে উপলব্ধি করতে পারবে। চক্ষু বুঁজে যে যতটা না করতে পারবে, তার চেয়ে বেশী কাজ তুমি করতে পারবে। এই প্রত্যক্ষ মানচিত্র হচ্ছে সবচেয়ে বেশী মূল্যবান। এই যে অভাব অভিযোগ, তার মধ্যে তুমি বলবে, 'হা প্রভু।' মনের মধ্যে উথাল-পাথাল যত আসবে, গাঁথনী তত পাকা হবে। তোমার চিন্তাধারার সাথে সাথে মনের উদ্দেশ্য যেকোন ভাবে সফল করতে পারবে। তোমার গাঁথনী এমন সুন্দর হয়ে যাবে যে, নিজেই অবাক হয়ে যাবে। যেই ধারা থেকে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে, তুমি তার ফল সহজে বুঝতে পারবে। **মহান চিন্তার সাথে যারা এক হয়ে আছে, তারাই পূর্ণ অবতার আর মহান হয়ে গেছে। তারাই অনন্ত পথের যাত্রিক।**

তখন সাধকরা বললেন, 'আমরা তো এইভাবে চিন্তা করি নাই'।

আমি— ঘরে তরকারি থাকলেই তো রান্না হয় না। তাকে কাটতে হবে। তারপর রান্না করতে হবে। কিভাবে তেল, ঘি, মশলা, আলু, কুমড়া সব মিশিয়ে রান্না করলে স্বাদ পাবে, জানতে হবে। আবার আলাদাভাবে কুমড়ার স্বাদ, আলুর স্বাদ সবই পাচ্ছ।

সাধুদের বললাম, তোমরা আনন্দসূত্র ধরে এসেছ, সেভাবেই যাও। তোমরা আনন্দমেলায় এসেছ, আনন্দ ঠিক পাবে। সৃষ্টির নিয়ম

এত মধুময়। চাক হতে আমরা যেমন মধু পাই; মধুকররা কিভাবে মধু নিয়ে আসে, আমরা চিবাতে গেলে তিতা লাগবে। আকাশে বাতাসে জলে এত মধু রয়েছে, সেই মধুময়ের চিন্তাতেই এত মধু আসে। জিহ্বার স্বাদ সাংঘাতিক। একটু গভীরভাবে চিন্তা কর, আপনি স্ফূরণ হবে। অতি সহজে উপলব্ধি হবে।

প্রঃ— মনই কি স্রষ্টা?

উঃ— হ্যাঁ।

প্রঃ— মনের স্রষ্টা কে?

উঃ— মনের স্রষ্টা মন।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

-ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ-

১) কৃষ্ণা, S.T.D. বুথ, বি-২ বাজার, M.A.M.C. দুর্গাপুর - ১০
ফোন - ০৩৪৩-৫৫৬০১২৯
২) রাম নারায়ণ রাম ভবন, রেখা মিত্র, ৪৭ নতুন পল্লী, বর্ধমান
৩) জয়ন্ত দে, আহেরী টোলা ষ্ট্রীট, কোলকাতা-৫, ফোন - ২৫৩০-৪৮০৭
৪) সৌরীন্দ্র নাথ বাগচি, দক্ষিণেশ্বর, কোলকাতা - ৭৬, ফোন - ২৫৬৪-২৪৪১
৫) বিনয় মোদক, মধ্যমগ্রাম, কোল - ১৩০, ফোন - ২৫৩৭-১৫৯৩
৬) গৌর মুখার্জী, ১১/৫, পর্ণশ্রী, বেহালা, ফোন - ২৪৪৫-৯২২০
৭) ডঃ সুধাংশু দত্ত, মালিগাঁও, গুয়াহাটি, আসাম, ফোন - ০৯৪৩৫১৯০৭৮১
৮) কোলকাতা বইমেলা।
৯) জলধর সাহা, সেক্রেটারী সন্তান দল, মেঘালয়, মোঃ- ৯৪৩৬১১২৬০১
১০) বলরাম, ৩৪ এস. কে. দেব রোড, কোল - ৭০০০৪৮
১১) Lakshindhar Das, Balasor, Orrisa, Phone : 92387-10622
১২) বেদপ্রজ্ঞা মহিলা সংগঠন, লেকটাউন, কোলকাতা, ফোন - ২৫৩৪-৬১৩৬
১৩) সুভাষ ঘোষ, বিলাসীপাড়া, আসাম, ফোন - ০৩৬৬৭-২৫১১৭৯
১৪) বাপি অধিকারী — কোটাল হাট বর্ধমান, ফোন - ৯২৩২৬৮৪২৫৯
১৫) উত্তম চ্যাটার্জী — নিয়ামতপুর, আসানসোল, ফোন - ০৩৪১-২৫১৫০৬৬
১৬) মধুসূদন মুখার্জী, পুরুলিয়া, ফোন - ০৯৯৩২৩৬৮৩৭৮
১৭) দেবু (নেতাজী দেবু) গড়িয়া, কোলকাতা, ফোন - ৯০০৭০৭৫১৯৯
১৮) আইডিয়াল বুক হাউস, কলেজ স্কোয়ার, কোলকাতা - ৭০০০০৯
১৯) তরুন/ইরা জোয়ারদার, বাবুপাড়া, জলপাইগুড়ি, ০৩৫৬১-২২৪৫১৯
২০) রমা নাথ মহন্ত, বালুরঘাট, দঃ দিনাজপুর, মোঃ- ০৯৭৩৩৩৩৯৪৩২
২১) আর.এন.আর এন্টারপ্রাইজ, ফোন - ২৪৪০-৯১৫১
২২) ভোলানাথ দাস, কালনা গেট, বর্ধমান, ফোন - ৯৪৭৪৬৯৫৬৫৪
২৩) তপন / অনিমা গাঙ্গুলী, মানকুন্ডু, হুগলী, ফোন - ২৬৮৫-৬১৪৬
২৪) কালিপদ চক্রবর্ত্তী, পাখানজোড়, ছত্রিশগড়, মোঃ- ৯৪০৬০০১৫৭২
২৫) গনেশ রায়, ফালাকাটা, জলপাইগুড়ি, মোঃ- ৯৭৪৯০৯০১৮২
২৬) বেদ অভেদ ধাম, হরে কৃষ্ণ, আলিপুরদুয়ার জং, মোঃ- ৯৪৩৪২০৪৫৯০
২৭) ইতি বর্মন, দিনহাটা, কুচবিহার, মোঃ- ৯৯৩২৬৩৯৬৩৯

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

অভিনব দর্শন প্রকাশনের প্রকাশিত পুস্তক সমূহ

পুস্তক পরিচিতি	*প্রকাশকাল*
১) বালক ব্রহ্মচারী ট্রাষ্টের নিবেদন	শুভ মহালয়া, ১৪১১
২) মৃত্যুর পর	শুভ মহালয়া, ১৪১১
৩) পরপারের কান্ডারী	শুভ বড়দিন, ১৪১১
৪) সাম্যের প্রতীক শিবশম্ভু	শুভ শিবরাত্রি, ১৪১১
৫) অঙ্গীকার	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১২
৬) ১৬ মাত্রায় নির্বিকল্প সমাধি	শুভ ১০ই আষাঢ়, ১৪১২
৭) বীজ ও মহাসৃষ্টি	শুভ মহালয়া, ১৪১২
৮) শুভ উৎসব	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১২
৯) তত্ত্বসিন্ধু	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১২
১০) দেহী বিদেহী	শুভ নববর্ষ, ১৪১৩
১১) পথপ্রদর্শক	শুভ ১০ই আষাঢ়, ১৪১৩
১২) অমৃতের স্বাদ	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৩
১৩) বৈদিক বিপ্লব	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৩
১৪) সুরের সাগরে	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৪
১৫) পথের পাথেয়	শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৪
১৬) জন্ম মৃত্যু রহস্য	শুভ মহালয়া, ১৪১৪
১৭) মহাশূন্য মহাচেতনার সাগর	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৪
১৮) আলোর বার্তা	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৪
১৯) কেন এই সৃষ্টি	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৫
২০) জন্মসিদ্ধ মহানের নির্দেশ	শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৫
২১) তত্ত্বদর্শন	শুভ মহালয়া, ১৪১৫
২২) মহামন্ত্র মহানাম	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৫
২৩) পাত্র ও মাত্রাজ্ঞান	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৫
২৪) চেতনা ও মহাচৈতন্য	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৬
২৫) মনই সৃষ্টির উৎস	শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৬
২৬) সাধু হও সাবধান	শুভ মহালয়া, ১৪১৬
২৭) লং পাহাড়ের ডায়েরী	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৬

'বেদপ্রজ্ঞা কমিউনিকেসন্' এর নিবেদন ঃ-

১) পরমপিতা (ভিডিও সিডি, Vol. 1)	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৩
২) পরমপিতা (ভিডিও সিডি, Vol. 2)	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৪
৩) পরমপিতা (ভিডিও সিডি, Vol. 3)	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৫